ঠাকুরমার ঝুলি

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

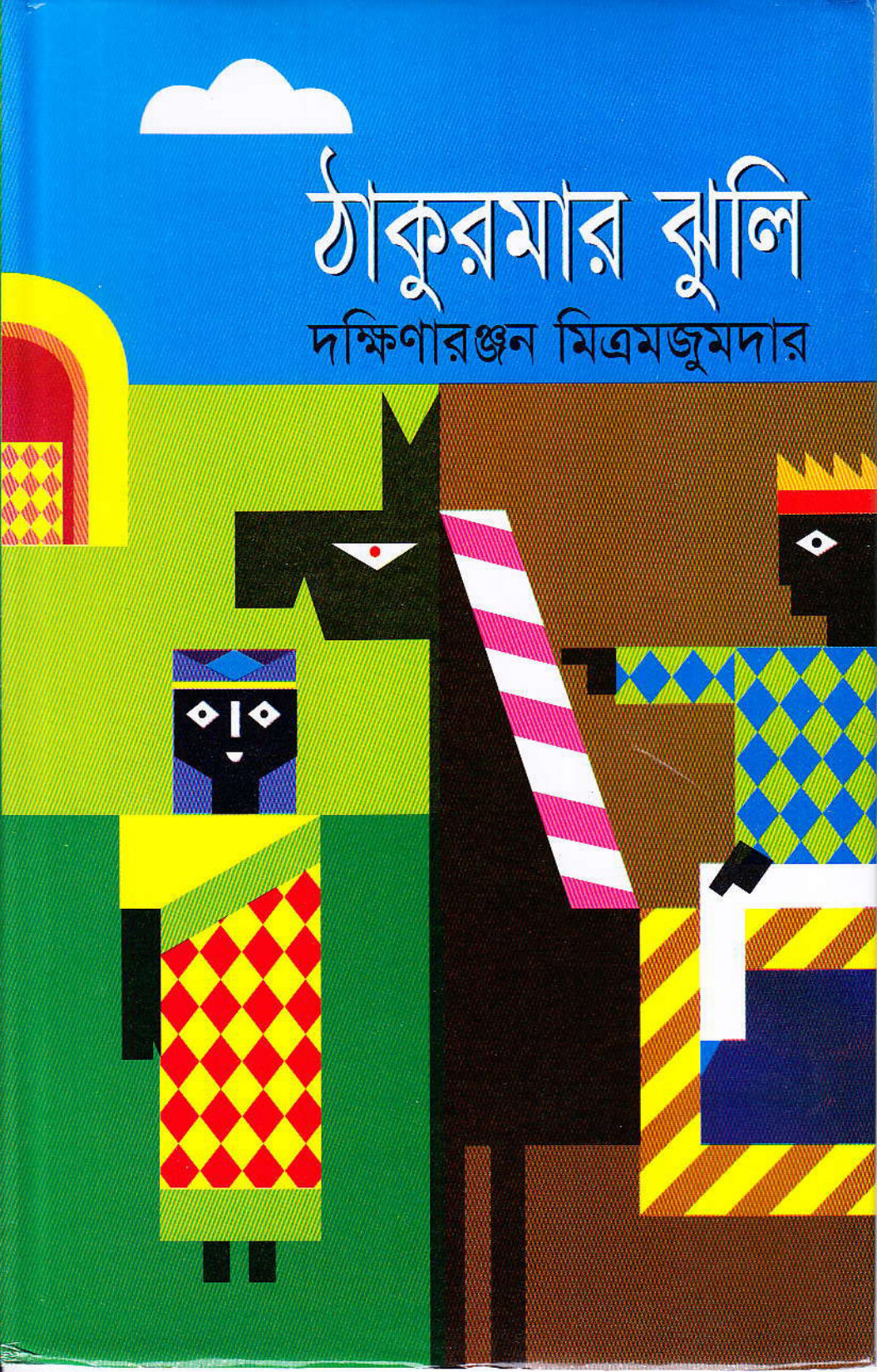

www.alorpathsala.org

আলোর পাঠশালা

School of Enlightenment

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

আ লো কি ত মা নু ষ চা ই

বাংলার কথাসাহিত্য

ঠাকুরমার ঝুলি

বাংলার রূপকথা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

সম্পাদনা ।। আহমাদ মাযহার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
আলোকিত মানুষ চাই
798537

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৬২

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৪০৬ নভেম্বর ১৯৯৯

পঞ্চম সংস্করণ দশম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অলঙ্করণ
মিত্র ও ঘোষ সংস্করণে ব্যবহৃত
দক্ষিণারঞ্জন অঙ্কিত ছবি অবলম্বনে

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0161-2

বাংলা রূপকথা ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের *ঠাকুরমার ঝুলি*

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সাফল্যজনকভাবে তাঁর *ঠাকুরমার ঝুলি* বইয়ে সহজ সরল গ্রামীণ অনুষঙ্গময় ভাষায় চিরায়ত বাংলা রূপকথার সেরা কয়েকটি গল্পকে সংকলিত করেছিলেন বলেই হয়তো পরবর্তী একশো বছর ধরে বাংলাসাহিত্যে রূপকথা এক আদরণীয় মাধ্যম হিসেবে পাঠকমহলে গৃহীত হয়ে আসছে। কিন্তু বাংলা লোককথার বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে সে-বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা এখনও সাহিত্যিক মহলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যদিও বেশ কিছুকাল আগেই লোকতত্ত্ববিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এইসব আঙ্গিকের সুস্পষ্ট পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন এবং মোটামুটিভাবে আঙ্গিকগুলোর সংজ্ঞা নিরূপণ করে দিয়েছেন। রূপকথা, লোককথা বা Folktales, উপকথা, ব্রতকথা ইত্যাদি শব্দগুলো এখনও প্রায়শই একই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে যদিও এতে অর্থগত পার্থক্য অনেক।

সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী জাতিগুলোর মধ্যে জাতীয় নিজস্বতা চিহ্নিত লৌকিক সাহিত্য গড়ে ওঠে; সে-সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে নানা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক ধরনের কাহিনী। স্বভাবতই মানুষ ভালোবাসে গল্প শুনতে; গদ্য, পদ্য, গীতিকা ইত্যাদি নানা উপায়ে মানুষ গল্প বর্ণনা করে। গদ্য ভাষায় যে-গল্প বর্ণিত হয় তার নাম কথাসাহিত্য। বহু শতবর্ষ ধরে জনসাধারণের মুখে মুখে এ-সব কাহিনী গড়ে ওঠে বলে এ-সব কাহিনীকে লোককথা বলাই যথার্থ।

ঠাকুরমার ঝুলি বইয়ের সবগুলো গল্পই লোককথা, রূপকথা নয়। বইয়ের প্রথম দুটি পর্ব হল দুধের সাগর ও রূপ-তরাসী। এগুলোর দশটি গল্পই রূপকথা; চ্যাং ব্যাং পর্বের গল্পগুলো লোককথা হলেও রূপকথা নয়। সুতরাং *ঠাকুরমার ঝুলি* সম্পন্ন অর্থে রূপকথার সংকলন নয়। তাহলে কাকে বলে রূপকথা? বাংলাসাহিত্যে এ নিয়ে এখনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপিত না হলেও দীনেশচন্দ্র সেন, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ড. মলয় বসু বাংলা রূপকথার বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করে রূপকথাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং মলয় বসু উভয়েই এ-কাজে জার্মান তাত্ত্বিক Albert Wesselski-র Versuch einer theorie des Marchens-এর বরাত দিয়েছেন। বর্তমান রচনাতেও ঐ দৃষ্টিভঙ্গিকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়েছে।

বাংলাভাষার রূপকথা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে সাধারণভাবে Fairy Tales শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে Fairy Tales আর রূপকথা এক নয়। কারণ বাংলা লোককথার দু-একটি গল্পে পরীর উপস্থিতি থাকলেও আমরা যাকে রূপকথা বলি তার সবই পরীকাহিনী নয়। গ্রিম ভাইয়েরা তাদের লোককথার সংকলনে যে-সব গল্প অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তাতে পরীর উপস্থিতি ছিল বলে সেগুলোকে Fairy Tales বলা যায়। কিন্তু *ঠাকুরমার ঝুলির* গল্পগুলোতে পরীর উপস্থিতি নেই। বাংলা লোককথার কিছু কিছু গল্পে বাঘ, কুমির, শেয়াল, কুকুর, বিড়াল, কাক, চিল, চড়াই ইত্যাদি পশুপাখির অস্তিত্ব আছে। এসব গল্পের সত্যি পরিচয় রূপকথা নয়—উপকথা। কিছু লোককথা আছে যেগুলোর উপজীব্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার। এধরনের গল্পকে বলা হয় ব্রতকথা। দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনের জন্য সে-সব গল্পের চরিত্ররা নানা ব্রত পালন করে। গঠনগত দিক থেকে অনেকটা মিল আছে বলেও এগুলোকে রূপকথা বলে ভ্রম হতে পারে। কিছুকিছু গল্প গড়ে উঠেছে ভূতপ্রেত নিয়ে। এগুলোও রূপকথা নয়। কোনো কোনো লোককথায় অনেক সময় দেখা গেছে ইতিহাসের চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, কিংবদন্তির গল্প প্রাধান্য পেয়েছে। এগুলোও রূপকথা নয়।

অর্থাৎ বাংলা রূপকথার গল্পকে হতে হবে এমন যাতে পরীদের ভূমিকা প্রধান হবে না, গল্পগুলো কোনো দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের বাহন হবে না, ইতিহাসের কোনো চরিত্র নায়ক হয়ে উঠবে না, গল্পে ভূতপ্রেত বা পশুপক্ষীর উপস্থিতি থাকলেও তারা গল্পের নিয়ন্তা হবে না। রূপকথার গল্পে যে-সব পশুপাখি থাকবে তারা হবে অপ্রাকৃত—যেমন রাক্ষস-রাক্ষসী, পক্ষিরাজ, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী ও শুক-শারী ইত্যাদি। সবকিছুর ওপরে সে-সব গল্পে মানুষের প্রাধান্য থাকতে হবে। তবে সে-মানুষের বাস্তব পরিচয় থাকবে না। গল্পগুলোতে যে-সব দেশের উল্লেখ থাকবে সে-সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল জাগবে না। নর-নারীর ভালোবাসা এবং নিয়তি বা অদৃষ্ট হবে সে-সব গল্পের প্রধান উপজীব্য। এসব গল্পকে অবশ্যই মিলনাত্মক হতে হবে এবং এতে শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবে। এসব গল্পে দুষ্টের পরাজয় ঘটবে। প্রাচীন লোকবিশ্বাস বা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকবে গল্পগুলোর সঙ্গে। কিন্তু সরাসরি কোনো নীতি বা উপদেশ প্রদানের মধ্য দিয়ে তা শেষ হবে না। রূপকথার গল্পে কোনো কৌতুকরস থাকবে না। ভাষা হবে কাব্যধর্মী। সরল, গ্রামীণ, স্নিগ্ধ ও অনুভূতিময় গদ্যে গল্পের ঘটনাবলি বর্ণিত হবে।

রূপকথা পাঠককে হাত ধরে নিয়ে যায় এক অসম্ভব সুন্দরের ভুবনে। মাটির পৃথিবীর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। রাজপুত্রেরা সেখানে অভিযানে বের হচ্ছে, রাক্ষসদের হত্যা করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করছে, তারপর তার লাভ হচ্ছে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব। তার সে অভিযান কখনো শেষ হয় না। কারণ রূপকথার ভুবনে সময় একেবারে স্থির। রূপকথা শব্দটি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারপাশে একটা রহস্যঘন মাধুর্য জেগে ওঠে ও সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলোর মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। অথচ আশ্চর্য এই যে, বাংলা রূপকথায় যে অসম্ভবের দেশের সন্ধান পাওয়া যায় তার ভিত্তি আমাদের চারপাশের বাস্তবতা। গল্পগুলোকে বিশ্লেষণ করলে সেগুলোর রচয়িতাদের সমাজ-সচেতনতা, জীবনদৃষ্টি, মানুষের প্রতি কল্যাণবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আরো বোঝা যায় যে গল্পগুলো গ্রামনির্ভর জীবনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। গ্রামের মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, খাদ্য-সামগ্রী, পরিধেয় বসন, অলঙ্কার, প্রসাধন-সামগ্রী, ঘরবাড়ি, বাদ্যযন্ত্র, ফুল ও বৃক্ষ, পরিবহন, অস্ত্রশস্ত্র, বিদ্যায়তন ইত্যাদির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বাংলা রূপকথা কৃষিভিত্তিক গ্রামনির্ভর জীবন থেকে তার শক্তি আহরণ করেছিল। রাজা, রাজপ্রাসাদ, মূল্যবান অলঙ্কারাদি, মহার্ঘ বসন ইত্যাদির যে উল্লেখ রূপকথায় পাওয়া যায় তার আড়ালটুকু সরিয়ে নিলেই সামন্তযুগের বাংলার আর্থসামাজিক জীবনের পরিচয় বেরিয়ে পড়তে

দেখা যায়। সে-কারণে প্রাচীন রূপকথার রাজার সঙ্গে রাখালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, রাজপুত্র-রাজকন্যাকে গ্রাম্য পাঠশালায় পড়তে যেতে হয়, গা মাজবার জন্য ঘরে তাদের খৈল-গামছা ব্যবহার করতে হয়। প্রাচীন বাংলা রূপকথার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তাতে নারীচরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। *ঠাকুরমার ঝুলি* বইয়ের কলাবতী রাজকন্যা, কাঁকনমালা-কাঞ্চনমালা, সাতভাই চম্পা, রূপবতী, কিরণমালা, মণিমালা, সোনার কাঠি রূপার কাঠি—প্রতিটি গল্পেরই প্রধান চরিত্র নারী। বাংলার গ্রামে যে একসময় নারীরাই প্রধান ছিল তার প্রমাণ এইসব গল্পে নারীচরিত্রের প্রাধান্য। এগুলো গড়েও উঠেছিল প্রধানত নারীদের মুখে মুখে।

প্রাচীন রূপকথায় যে-সব অস্ত্রশস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে ধনুর্বাণ, খড়্গ ও তলোয়ারই প্রধান। বাংলা রূপকথায় মহাভারত-এর প্রভাবই এর কারণ। মহাভারত-এর প্রভাবেই সম্ভবত প্রাচীন রূপকথায় পাশাখেলার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে বাংলা রূপকথার সংকলয়িতাদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারই সত্যিকারের পথিকৃৎ। পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে অনেকেই রূপকথা সংগ্রহ ও সংকলন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ রূপকথা সংকলনের নামও রেখেছেন *ঠাকুরমার ঝুলি*।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের *ঠাকুরমার ঝুলি* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে। বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ১৯০৫ ও ১৯০৬ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসনের উপায় নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে ১৯০৫ সালে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল। ইতিহাসে তা বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে দুর্বার গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনই স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত হয়েছিল। আন্দোলনের তীব্রতায় ইংরেজ সরকার একসময় বাধ্য হয় বঙ্গভঙ্গ রদ করতে। আন্দোলনের সময় বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটে; স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে সে-সময়ই। নানা কারণে স্বদেশী আন্দোলন সফল না হলেও তা বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিপুল প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়। স্বদেশী চেতনার মূলে ছিল বাংলার খাঁটি নিজস্বতাকে সন্ধান করা ও সংরক্ষণ করা। সারাদেশে তখন নিজস্বতা চর্চার এক উন্মত্ততা চলছিল। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের মধ্যে স্বাদেশিক চেতনার উন্মাদনা জেগে উঠেছিল এক ভিন্ন পথে। তিনি বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে মানুষের মুখে মুখে সৃষ্ট সোনালি সম্পদ লোককথা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাংলাসাহিত্য পেল বিপুল এক সম্ভার। শুধু *ঠাকুরমার ঝুলিই* নয়, একে একে প্রকাশিত হল *ঠাকুরদাদার ঝুলি* (১৯০৯), *ঠানদিদির থলে* (১৯০৯), *দাদামশায়ের থলে* (১৯১৩) প্রভৃতি গ্রন্থ। এসব গন্থে তিনি ধারণ করে রাখলেন গ্রামবাংলার চিরকালের সম্পদ গীতিকথা, রূপকথা, ব্রতকথা ও রসকথা প্রভৃতি কথাসাহিত্যকে।

ঠাকুরমার ঝুলি দক্ষিণারঞ্জনের মৌলিক গ্রন্থ নয়—ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গল্পের সংকলন; তাহলে কোথায় এর মৌলিকতা? আমরা জানি যে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাষায় যে আঞ্চলিকতা থাকার কথা তা *ঠাকুরমার ঝুলি* বইটির বর্তমানে প্রাপ্য সংস্করণগুলোতে পুরোপুরি নেই। তিনি মনে করেছিলেন যে আঞ্চলিক ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিকৃত করলে রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটতে পারে, তাই প্রথম সংস্করণে গ্রাম্য বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন; কিন্তু বৃহত্তর পাঠকের সুবিধার কথা বিবেচনা করে তিনি হয়তো ভাষায় কিছুটা সংস্কার করে থাকবেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল গ্রামের মানুষের বাগ্‌ভঙ্গিটি বজায় রাখা। সে জন্যে তিনি ছেদ, হাইফেন ও হরফ চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। অনেকটা সঙ্গীতের স্বরলিপির ভূমিকা পালন করেছে ঐসব চিহ্নগুলো। সুদূর অতীতে রূপকথার কথকেরা যেভাবে গল্প বলতেন, তখন তাঁদের কণ্ঠের উত্থান-পতন যেভাবে ঘটত, সাঙ্গীতিক সুরবৈচিত্র্যের প্রকাশ যেভাবে ঘটত তার পরিচয় দক্ষিণারঞ্জন দেয়ার চেষ্টা করেছেন কখনো বড় বা মোটা হরফ ব্যবহার করে, কখনো বাক্যের

ঠাকুরমার ঝুলি

গ্রন্থকারের নিবেদন

এক দিনের কথা মনে পড়ে, দেবালয়ে আরতির বাজনা বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে, মা'র আঁচলখানির উপর শুইয়া রূপকথা শুনিতেছিলাম।

"জ্যোচ্ছনা ফুল ফুটেছে" ; মা'র মুখের এক একটি কথায় সেই আকাশ-নিখিল-ভরা জ্যোৎস্নার রাজ্যে, জ্যোৎস্নার সেই নির্মল শুভ্র পটখানির উপর পলে পলে কত বিশাল "রাজ-রাজত্ব", কত "অছিন অভিন্" রাজপুরী, কত চিরসুন্দর রাজপুত্র রাজকন্যার অবর্ণনীয় ছবি আমার শৈশব চক্ষুর সামনে সত্যকারটির মত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সে যেন কেমন—কতই সুন্দর! পড়ার বইখানি হাতে নিতে নিতে ঘুম পাইত ; কিন্তু সেই রূপকথা তা'রপর তা'রপর তা'রপর করিয়া কত রাত জাগাইয়াছে! তা'রপর শুনিতে শুনিতে শুনিতে শুনিতে, চোখ বুজিয়া আসিত;—সেই অজানা রাজ্যের সেই অচেনা রাজপুত্র সেই সাতসমুদ্র তের নদীর ঢেউ ক্ষুদ্র বুকখানির মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে খেলিয়া বেড়াইত,—আমার মত দুরন্ত শিশু!—শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।

বাঙ্গালার শ্যামপল্লীর কোণে কোণে এমনি আনন্দ ছিল, এমনি আবেশ ছিল। মা আমার অফুরাণ রূপকথা বলিতেন।—জানিতেন বলিলে ভুল হয়, ঘর-কন্নায় রূপকথা যেন জাড়ানো ছিল ; এমন গৃহিণী ছিলেন না যিনি রূপকথা জানিতেন না,—না জানিলে যেন লজ্জার কথা ছিল। কিন্তু এত শীঘ্র সেই সোণা-রূপার কাটী কে নিল, আজ মনে হয়, আর ঘরের শিশু তেমন করিয়া জাগে না, তেমন করিয়া ঘুম পাড়ে না!

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীকে এক অতি মহাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন ; হারাণো সুরের মণিরত্ন মাতৃভাষার ভাণ্ডারে উপহার দিবার যে অতুল প্রেরণা, তাহার মূল ঝরণা হইতেই জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে দেশজননীর স্নেহধারা—এই—বাঙ্গালার রূপকথা।

মা'র মুখের অমৃত-কথার শুধু রেশগুলি মনে ভাসিত; পরে, কয়েকটি পল্লীগ্রামের বৃদ্ধার মুখে আবার যাহা শুনিতে শুনিতে শিশুর মত হইতে হইয়াছিল, সে সব ক্ষীণ বিচ্ছিন্ন কঙ্কালের উপরে প্রায় এক যুগের শ্রমের ভূমিতে এই ফুল-মন্দির রচিত। বুকের ভাষার কচি পাপড়িতে সুরের গন্ধের আসন: কেমন হইয়াছে বলিতে পারি না।

অবশেষে বসিয়া বসিয়া ছবিগুলি আঁকিয়াছি। যাঁদের কাছে দিতেছি, তাঁহারা ছবি দেখিয়া হাসিলে, জানিলাম আঁকা ঠিক হইয়াছে।

শরতের ভোরে ঝুলিটি আমি সোণার হাটের মাঝখানে আনিয়া দিলাম। আমার মা'র মতন মা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আবার দেখিতে পাই! যাঁদের কাজ তাঁরা আবার আপন হাতে তুলিয়া নেন।

যেমন চাহিয়াছিলাম, হয়তো হয় নাই ; কিন্তু বই যে সত্বরে প্রকাশিত হইল, ইহার ব্যবস্থায় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র আমার অগ্রজ-প্রতিম সুহৃদ্বর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ই অগ্রণী। তাঁহার আদরের 'ঝুলি' তাঁহার ঋণ শোধ করিতে পারিবে না।

আমার ছোট বোনটি অনেক খুঁটিনাটিতে সাহায্য করিয়াছে। প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত সেন মুদ্রণাদিতে প্রাণপাতে আমার জন্য খাটিয়াছেন। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতার ভাষা নাই।

জ্যোৎস্নাবিধৌত স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় আরতির বাদ্য বাজিয়াছে। এ সুলগ্নে যাঁদের ঝুলি, তাঁদের কাছে দিয়া—বিদায় লইলাম।

---

* *এটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কথা ; আমি শুনিয়াছিলাম, 'জ্যোৎস্না ভিণ্ ফুটেছে', কোন একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি 'জ্যো'স্না ফিনিক ফুটছে'। কোথাও কোথাও শুনিয়াছি, 'জ্যোছনা ফটিক ছুটছে।'*

কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ভাদ্র ১৩১৪ : ত্রয়োদশ সংস্করণ ভাদ্র ১৩৫১ থেকে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা

ঠাকুরমার ঝুলিটির মতো এত বড় স্বদেশী জিনিশ আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরি হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের 'Fairy Tales' আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানি একেবারে দেউলে। তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোনো কোনো স্থলে মার্টিনের এথিক্স্ এবং বার্কের ফরাসি বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল—রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, কোথায়—সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মাণিক!

পালা পার্বণ যাত্রা গান কথকতা এ-সমস্তও ক্রমে মরানদীর মতো শুকাইয়া আসাতে, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্ক লোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে। তাহার পরে দেশের শিশুরাও কোন্ পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল। তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এমন নীরব কেন? তাহাদের পড়াঘরের কেরোসিন্-দীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায় তাহাতে কেবল বিলাতি বানান-বহির বিভীষিকা। মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে!

কেবলি বইয়ের কথা! স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল! দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা কোথায়!

এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালিবালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।

অতএব বাঙ্গালির ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।

দক্ষিণারঞ্জনবাবুর *ঠাকুরমার ঝুলি* বইখানি পাইয়া, তাহা খুলিতে ভয় হইতেছিল। আমার সন্দেহ ছিল, আধুনিক বাংলার কড়া ইস্পাতের মুখে ঐ সুরটা পাছে বাদ পড়ে। এখনকার কেতাবি ভাষায় ঐ সুরটি বজায় রাখা বড় শক্ত। আমি হইলে তো এ কাজে সাহসই করিতাম না। ইতিপূর্বে কোনো কোনো গল্পকুশলা অথচ শিক্ষিতা মেয়েকে দিয়া আমি রূপকথা লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু হৌক মেয়েলি হাত, তবুও বিলাতি কলমের জাদুতে রূপকথায় কথাটুকু থাকিলেও সেই রূপটি ঠিক থাকে না; সেই চিরকালের সামগ্রী এখনকার কালের হইয়া উঠে।

কিন্তু দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলা দেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্য অবিলম্বে একটা স্কুল খোলা হউক এবং দক্ষিণাবাবুর এই বইখানি অবলম্বন করিয়া শিশু-শয়ন-রাজ্যে পুনর্বার তাঁহার নিজেদের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোলপুর
২০শে ভাদ্র, ১৩১৪

উৎসর্গ

নীল আকাশে সূয্যিমামা ঝলক দিয়েছে,
সবুজ মাঠে নতুন পাতা গজিয়ে উঠেছে,
পালিয়ে ছিল সোণার টিয়ে ফিরে এসেছে ;
ক্ষীর নদীটির পারে খোকন হাস্‌তে লেগেছে,
হাস্‌তে লেগেছে রে খোকন্ নাচ্‌তে লেগেছে,
মায়ের কালে চাঁদের হাট ভেঙ্গে পড়েছে।
লাল টুক্ টুক্ সোনার হাতে কে নিয়েছে তুলি'
ছেঁড়া নাতা পুরোণ কাঁথার—

ঠাকুরমা'র ঝুলি

—বাঙ্‌লা-মা'র বুক-জোড়া ধন—
এত কি ছিল ব্যাকুল মন।

—ওগো।—
ঠাকুরমার বুকের মাণিক, আদরের 'খোকা খুকি'।
চাঁদমুখে হেসে, নেচে নেচে এসে, ঝুলির মাঝে দে উঁকি!
ওগো!
সুশীল সুবোধ, চারু হারু বিনু লীলা শশি সুকুমারি !
দ্যাখ তো রে এসে খোঁচা খুঁচি দিয়ে ঝুলিটারে
নাড়ি' চাড়ি।'

—ওগো!—
বড় বৌ, ছোট বৌ। আবার এসেছে ফিরে'
সেকালের সেই রূপকথাগুলো তোমারি আঁচল ঘিরে'!
ফুলে ফুলে বয় হাওয়া, ঘুমে ঘুমে চোখ ঢুলে,
কাজগুলো সব লুটুপুটি খায় আপন কথার ভুলে।
এমন সময় খুঁটে লুটে' এনে হাজার যুগের ধূলি
চাঁদের হাটের মাঝখানে'—মা!—ধুপুস্ করা—

ঝুলি!!

হাজার যুগের রাজপুত্র রাজকন্যা সবে
রূপসাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এল কবে!
হাঁউ মাঁউ কাঁউ শব্দ শুনি রাক্ষসেরি পুর—
না জানি সে কোন্ দেশে না জানি কোন্ দূর!
নতুন বৌ! হাঁড়ি ঢাক', শিয়াল পণ্ডিত ডাকে ;—
হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা কোন্ রাণীদের পাপে?

তোমাদেরি হারাধন তোমাদেরি ঝুলি
আবার এনে ঝেড়ে' দিলাম সোণার হাতে তুলি'!
ছেলে নিয়ে মেয়ে নিয়ে কাজে কাজে এলা—
সোণার শুকের সঙ্গে কথা দুপুর সন্ধ্যা বেলা,
পুপুর সন্ধ্যা বেলা লক্ষ্মি! ঘুম যে আসে ভুলি'!
ঘুম ঘুম ঘুম,
—সুবাস কুম্ কুম্—
ঘুমের রাজ্যে ছড়িয়ে দিও
ঠাকুরমা'র
এ
ঝুলি।

গাছের আগায় চিক্‌মিক্
আমার খোকন হাসে ফিক্ ফিক্!
নীলাম্বরীখান গায়ে দিয়ে, খোকার—মাসী এসেছে!
নদীর জলে খোকার হাসি ঢেলে' পড়েছে!

আয় রে আমার কাজ্‌লা বুধি, আয় রে আমার হুমো,—
গাছের আড়ে থামলো রে চাঁদ, আমার, সোণার মুখে চুমো!
ঘরে ঘরে লক্ষ্মীমণির পিদিম জ্বলেছে,
দেবতার দুয়ারে কাঁসর বেজে' উঠেছে—
নাচ্‌বে খোকা, নিবে প্রসাদ খোকন্ আমার গঙ্গাপ্রসাদ—
কোন্ স্বর্গের ছবি খোকন মর্ত্তে এনেছে?

ও খোকন, খোকন রে।
আর নেচো না, আর নেচো না নাচন ভেঙ্গে পড়েছে!—
দেখসে' আঙিনায় তো কে এসেছে!
আঙ্গিনেয় এলো চাঁদের মা দেখ্‌সে' খোকন্ দেখে যা,
ঝুলির ভেতর চাঁদের নাচন্ ভরে' এনেছে।
ঝুলির মুখ খোলা,— খোকার হাসি তোলা—তোলা—
ঠাকুরমা'র কোলটি জুড়ে কে রে বসেছে?

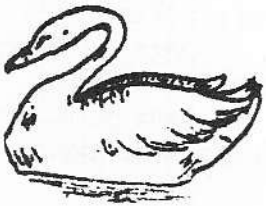

দুধের সাগর ■	কলাবতী রাজকন্যা	১৭
	ঘুমন্ত পুরি	৩১
	কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা	৩৫
	সাত ভাই চম্পা	৪০
	শীত-বসন্ত	৪৩
	কিরণমালা	৫৫
রূপ-তরাসী ■	নীলকমল আর লালকমল	৬৭
	ডালিমকুমার	৭৮
	পাতাল-কন্যা মণিমালা	৮৫
	সোনার কাটি রূপার কাটি	৯১
চ্যাং ব্যাং ■	শিয়াল পণ্ডিত	১০১
	সুখু আর দুখু	১০৮
	ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী	১১২
	দেড় আঙুলে	১১৮
	সোনা ঘুমাল	১২৭

দুধের সাগর

হাজার যুগের রাজপুত্র-রাজকন্যা সবে
রূপসাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এল কবে !

* * *

শুকপঙ্খী নায়ে চড়ে কোন্ কন্যা এল,
পাল তুলে পাঁচ ময়ূরপঙ্খী কোথায় ডুবে গেল,
পাঁচ রানি পাঁচ রাজার ছেলের শেষে হল কী,
কেমন দুভাই বুদ্ধু ভূতুম, বানর পেঁচাটি !

নিঝুম ঘুমে পাথরপুরী—কোথায় কত যুগ—
সোনার পদ্মে ফুটে ছিল রাজকন্যার মুখ !
রাজপুত্র দেশ-বেড়াতে কবে গেল কে—
কেমন করে ভাঙল সে ঘুম কোন্ পরশে !

ফুটল কোথায়, পাঁশগাদাতে সাত চাঁপা, পারুল,
ছুটে এল রাজার মালী তুলতে গিয়ে ফুল,
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ ফুলের কলি কার কোলেতে ?
হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা কাদের পাপে ॥

রাখাল বন্ধুর মধুর বাঁশি আজকে পড়ে মনে—
পণ করে পণ ভাঙল রাজা, রাখাল বন্ধুর সনে !
গা-ময় ছুঁচ পা-ময় ছুঁচ—রাজার বড় জ্বালা—
ডুব দে যে হলেন দাসি রানি কাঞ্চনমালা !

মনে পড়ে দুয়োরানির টিয়ে হওয়ার কথা,
দুঃখী দুভাই মা-হারা সে শীত-বসন্তের ব্যথা।
ছুটতে কোথায় রাজার হাতি পাটসিংহাসন নিয়ে ;
গজমোতির উজল আলোর রাজকন্যার বিয়ে !

বিজন দেশে কোথায় যে সে ভাসানে ভাই-বোন
গড়ল অবাক অতুলপুরী পরম মনোরম !
সোনার পাখি ভাঙল স্বপন কবে কী গান গেয়ে—
লুকিয়ে ছিল এসব কথা 'দুধ-সাগরে'র ঢেউয়ে !

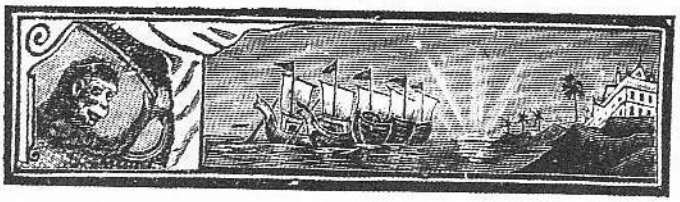

কলাবতী রাজকন্যা

১

ক যে, রাজা। রাজার সাত রানি—বড়রানি, মেজরানি, সেজরানি, ন-রানি, কনেরানি, দুয়োরানি আর ছোটরানি।

রাজার মস্তবড় রাজ্য ; প্রকাণ্ড রাজবাড়ি। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মানিক, কুঠরিভরা মোহর, রাজার সব ছিল। এ ছাড়া—মন্ত্রী, অমাত্য, সিপাই, লস্করে—রাজপুরি গমগম করিত।

কিন্তু রাজার মনে সুখ ছিল না। সাত রানি—এক রানিরও সন্তান হইল না। রাজা, রাজ্যের সকলে মনের দুঃখে দিন কাটেন।

একদিন রানিরা নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন—এমন সময়, এক সন্ন্যাসী যে, বড় রানির হাতে একটি গাছের শিকড় দিয়া বলিলেন, 'এইটি বাটিয়া সাত রানিতে খাও, সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।'

রানিরা মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া, কাপড়চোপড় ছাড়িয়া, গা-মাথা শুকাইয়া সকলে পাকশালে গেলেন। আজ বড়রানি ভাত রাঁধিবেন, মেজরানি তরকারি কাটিবেন, সেজরানি ব্যঞ্জন রাঁধিবেন, ন-রানি জল তুলিবেন, কনেরানি যোগান দিবেন, দুয়োরানি বাটনা বাটিবেন আর ছোটরানি মাছ কুটিবেন। পাঁচ রানি পাকশালে রহিলেন ; ন-রানি কুয়োর পাড়ে গেলেন, ছোটরানি পাঁশগাদার পাশে মাছ কুটিতে বসিলেন।

সন্ন্যাসীর শিকড়টি বড়রানির কাছে। বড়রানি দুয়োরানিকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বোন, তুই বাটনা বাটিবি, শিকড়টি আগে বাটিয়া দে না, সকলে একটু একটু খাই।'

দুয়োরানি শিকড় বাটিতে বাটিতে কতটুকু নিজে খাইয়া ফেলিলেন। তারপর রুপার থালে সোনার বাটি দিয়া ঢাকিয়া, বড়রানির কাছে দিলেন। বড়রানি ঢাকনা খুলিতেই আর কতকটা খাইয়া মেজরানির হাতে দিলেন। মেজরানি খানিকটা খাইয়া সেজরানিকে দিলেন। সেজরানি কিছু খাইয়া কনেরানিকে দিলেন। কনেরানি বাকিটুকু খাইয়া ফেলিলেন। ন-রানি আসিয়া দেখেন, বাটিতে একটু তলানি পড়িয়া আছে! তিনি তাহাই খাইলেন। ছোটরানির জন্য আর কিছুই রহিল না।

মাছ কোটা হইলে ছোটরানি উঠিলেন। পথে ন-রানির সঙ্গে দেখা হইল। ন-রানি বলিলেন, 'ও অভাগি! তুই তো শিকড়বাটা খাইলি না? যা, যা, শিগ্‌গির যা।' ছোটরানি আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া ছুটিয়া আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন, শিকড়বাটা একটুকুও নাই। দেখিয়া ছোটরানি আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িলেন।

তখন পাঁচ রানি এ-র দোষ ও দেয়, ও-র দোষ এ দেয়। এইরকম করিয়া সকলে মিলিয়া গোলমাল করিতে লাগিলেন।

ছোটরানির হাতের মাছ আঙিনায় গড়াগড়ি গেল, চোখের জলে আঙিনা ভাসিল।

একটু পরে ন-রানি আসিলেন। তিনি বলিলেন, 'ওমা ! ওর জন্য কি তোরা কিছুই রাখিস নাই? কেমন লো তোরা ! চলো বোন ছোটরানি, শিল-নোড়াতে যদি একাধটুকু লাগিয়া থাকে, তাই তোকে ধুইয়া খাওয়াই। ঈশ্বর করেন তো, উহাতে তোর সোনার চাঁদ ছেলের হইবে।' অন্য রানিরা বলিলেন—'তাই তো, তাই তো, শিল-নোড়ায় আছে, তাই ধুইয়া দেও।' মনে মনে বলিলেন, 'শিল-ধোয়া জল খাইলে সোনার চাঁদ না তো বানর চাঁদ ছেলে হইবে।'

ছোটরানি কাঁদিয়া-কাঁটিয়া শিল-ধোয়া জলটুকুই খাইলেন। তারপর, ন-রানিতে ছোটরানিতে ভাগাভাগি করিয়া জল আনিতে গেলেন। আর-রানিরা নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন।

ছোটরানি আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িলেন

২

দশ মাস দশ দিন যায়, পাঁচ রানির পাঁচ ছেলে হইল। এক-এক ছেলে যেন সোনার চাঁদ ! ন-রানি আর ছোটরানির কী হইল? বড়রানিদের কথাই সত্য, ন-রানির পেটে এক পেঁচা আর ছোটরানির পেটে এক বানর হইল।

বড়রানিদের ঘরের সামনে ঢোল-ডগর বাজিয়া উঠিল। ন-রানি আর ছোটরানির ঘরে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

রাজা আর রাজ্যের সকলে আসিয়া, পাঁচ রানিকে জয়ডঙ্কা দিয়া ঘরে তুলিলেন। ন-রানি, ছোটরানিকে কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না।

কিছুদিন পর ন-রানি চিড়িয়াখানার বাঁদি আর ছোটরানি ঘুঁটেকুড়ানি দাসি হইয়া দুঃখে-কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

৩

ক্রমে ক্রমে রাজার ছেলেরা বড় হইয়া উঠিল, পেঁচা আর বানর বড় হইল। পাঁচ রাজপুত্রের নাম হইল হিরারাজপুত্র, মানিকরাজপুত্র, মোতিরাজপুত্র, শঙ্খরাজপুত্র আর কাঞ্চনরাজপুত্র।

পেঁচার নাম হইল **ভূতুম**
আর
বানরের নাম হইল **বুদ্ধু**।

পাঁচ রাজপুত্র পাঁচটি পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কত সিপাই-লস্কর পাহারা থাকে। ভূতুম আর বুদ্ধু দুইজনে তাহাদের মায়েদের কুঁড়েঘরের পাশে একটা ছোট বকুলগাছের ডালে বসিয়া খেলা করে।

পাঁচ রাজপুত্রেরা বেড়াইতে বাহির হইয়া আজ ইহাকে মারে, কাল উহাকে মারে, আজ ইহার গর্দান নেয়, কাল উহার গর্দান নেয়। রাজ্যের লোক তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিল।

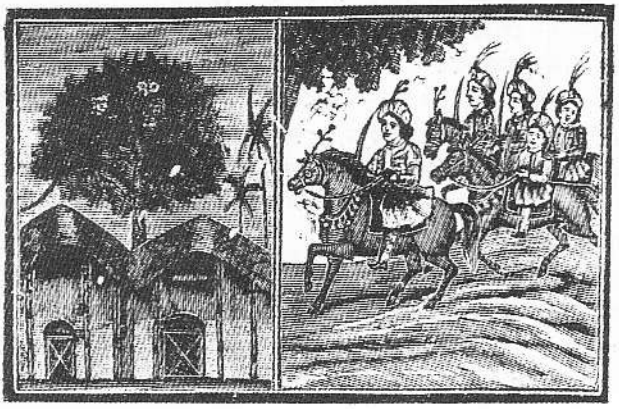

ভূতুম আর বুদ্ধু *পাঁচ রাজপুত্র*

ভূতুম আর বুদ্ধু, দুইজনে খেলাধুলা করিয়া যার-যার মায়ের সঙ্গে যায়। বুদ্ধু মায়ের ঘুঁটে কুড়াইয়া দেয়, ভূতুম চিড়িয়াখানার পাখির ছানাগুলিকে আহার খাওয়াইয়া দেয়। আর দুই-একদিন পর পর দুইজনে রাজবাড়ির দক্ষিণদিকে বনের মধ্যে বেড়াইতে যায়।

ভূতুমের মা চিড়িয়াখানার বাঁদি, বুদ্ধুর মা ঘুঁটেকুড়ানি দাসি। কোনোদিন খাইতে পায়, কোনোদিন পায় না। বুদ্ধু দুই মায়ের জন্য বনজঙ্গল হইতে কত রকমের ফল আনে। ভূতুম ঠোঁটে করিয়া দুই মায়ের পান খাইবার সুপারি আনে। এইরকম করিয়া ভূতুম, ভূতুমের মা, বুদ্ধু, বুদ্ধুর মা-র দিন যায়।

একদিন পাঁচ রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটাইয়া চিড়িয়াখানা দেখিতে আসিলেন। আসিতে পথে দেখিলেন, একটি পেঁচা আর একটি বানর বকুলগাছে বসিয়া আছে। দেখিয়াই তাঁহারা সিপাই-লস্করকে হুকুম দিলেন, 'ঐ পেঁচা আর বানরটিকে ধর, আমরা উহাদিগে পুষিব।' অমনি সিপাই-লস্করেরা বকুলগাছে জাল ফেলিল। ভূতুম আর বুদ্ধু জাল ছিঁড়িতে পারিল না। তাহারা ধরা পড়িয়া, খাঁচায় বদ্ধ হইয়া রাজপুত্রদের সঙ্গে রাজপুরিতে আসিল।

চিড়িয়াখানা পরিষ্কার করিয়া ভূতুমের মা আসিয়া দেখেন, ভূতুম নাই! ঘুঁটে ছড়াইয়া বুদ্ধুর মা আসিয়া দেখেন, বুদ্ধু নাই! ভূতুমের মা হাতের ঝাঁটা মাটিতে ফেলিয়া বসিয়া পড়িলেন, বুদ্ধুর মা গোবরের ঝাঁটা ফেলিয়া দিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

৪

রাজপুরিতে আসিয়া ভূতুম আর বুদ্ধু অবাক! মস্ত মস্ত দালান, হাতি, ঘোড়া, সিপাই, লস্কর, কত কী!

দেখিয়া তাহারা ভাবিল, 'বাহ্! তবে আমরা বকুলগাছে থাকি কেন? মায়েরাই বা কুঁড়েয় থাকে কেন?' ভাবিয়া তাহারা বলিল, 'ও ভাই রাজপুত্র, আমাদিগে আনিয়াছ, তো মাদিগেও আনো।'

রাজপুত্রেরা দেখিলেন, বাহ্! ইহারা তো মানুষের মতো কথা কয়! তখন বলিলেন, 'বেশ বেশ, তোদের মায়েরা কোথায় বল্; আনিয়া চিড়িয়াখানায় রাখিব।'

ভূতুম বলিল, 'চিড়িয়াখানার বাঁদি আমার মা।'

বুদ্ধু বলিল, 'ঘুঁটেকুড়ানি দাসি আমার মা!'

শুনিয়া রাজপুত্রেরা হাসিয়া উঠিলেন—

'মানুষের পেটে আবার পেঁচা হয়!
মানুষের পেটে আবার বানর হয়!'

ছোটরানি আর ন-রানির কথা, রাজপুত্রেরা কিনা জানিতেন না! একজন সিপাই ছিল, সে বলিল, 'হইবে না কেন? আমাদের দুই রানি ছিলেন, তাঁহাদের পেটে পেঁচা আর বানর হইয়াছিল। রাজা সেইজন্য তাঁহাদিগে খেদাইয়া দেন। ইহারাই সেই পেঁচা আর বানর পুত্র।'

শুনিয়া রাজপুত্রেরা 'ছি ছি!' করিয়া উঠিলেন। তখনি খাঁচার উপর লাথি মারিয়া, রাজপুত্রেরা সিপাই-লস্করকে বলিলেন, 'এই দুইটাকে খেদাইয়া দাও।' বলিয়া রাজার ছেলেরা পক্ষিরাজে চড়িয়া বেড়াইতে চলিয়া গেলেন।

ভূতুম আর বুদ্ধু জানিল, তাহারাও রাজার ছেলে! ভূতুমের মা বাঁদি নয়, বুদ্ধুর মা দাসি নয়। তখন বুদ্ধু বলিল, 'দাদা, চল আমরা বাবার কাছে যাইব।'

ভূতুম বলিল, 'চল।'

৫

সোনার খাটে গা, রুপার খাটে পা রাখিয়া রাজপুরির মধ্যে পাঁচ রানিতে বসিয়া সিথিপাটি করিতেছিলেন। এক দাসি আসিয়া খবর দিল, নদীর ঘাটে যে শুকপক্ষী নৌকা আসিয়াছে, তাহার রুপার বৈঠা, হীরার হাল। নায়ের মধ্যে মেঘবরণ চুল, কুঁচবরণ কন্যা বসিয়া সোনার শুকের সঙ্গে কথা কহিতেছে।

শুকপক্ষী নৌকা অনেক দূরে চলিয়া গেল

অমনি নদীর ঘাটে পাহারা বসিল, রানিরা উঠেন-কি-পড়েন, কে আগে কে পাছে ; শুকপক্ষী নায়ে কুঁচবরণ কন্যা দেখিতে চলিলেন।

তখন নায়ে পাল উড়িয়াছে। শুকপক্ষী তরতর করিয়া ছুটিয়াছে।

রানিরা বলিলেন—

'কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল,
নিয়া যাও কন্যা মোতির ফুল।'

নৌকা হইতে কুঁচবরণ কন্যা বলিলেন—

'মোতির ফুল মোতির ফুল সে বড় দূর
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর পুর।
হাটের সওদা ঢোল-ডগরে, গাছের পাতে ফল।
তিন বুড়ির রাজ্য ছেড়ে রাঙা নদীর জল।'

বলিতে বলিতে শুকপক্ষী নৌকা অনেক দূর চলিয়া গেল।

রানিরা সকলে বলিলেন—

'কোন্ দেশের রাজকন্যা কোন্ দেশে ঘর?
সোনার চাঁদ ছেলে আমার, তোমার বর।'

তখন শুকপক্ষী আরও অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, কুঁচবরণ কন্যা উত্তর করিলেন—

'কলাবতী রাজকন্যা মেঘবরণ কেশ,
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর দেশ।
আনতে পারে মোতির ফুল ঢো-ল-ডগর,
সেই পুত্রের বাঁদি হয়ে আসব তোমার ঘর।'

শুকপক্ষী আর দেখা গেল না। রানিরা অমনি ছেলেদের কাছে খবর পাঠাইলেন। ছেলেরা পক্ষিরাজ ছুটাইয়া বাড়িতে আসিল।

রাজা সকল কথা শুনিয়া ময়ূরপক্ষী সাজাইতে হুকুম দিলেন। হুকুম দিয়া রাজা রাজসভায় দরবার করিতে গেলেন।

৬

মস্ত দরবার করিয়া রাজা রাজসভায় বসিয়াছেন। ভূতুম আর বুদ্ধু গিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। দুয়ারী জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কে?'

বুদ্ধু বলিল, **'বানররাজপুত্র।'**
ভূতুম বলিল, **'পেঁচারাজপুত্র।'**

দুয়ারী দুয়ার ছাড়িয়া দিল।

তখন বুদ্ধু একলাফে গিয়া রাজার কোলে বসিল। ভূতুম উড়িয়া গিয়া রাজার কাঁধে বসিল। রাজা চমকিয়া উঠিলেন, রাজসভায় সকলে 'হাঁ ! হাঁ !' করিয়া উঠিল।

বুদ্ধু ডাকিল, 'বাবা !'
ভূতুম ডাকিল, 'বাবা !'

রাজসভার সকলে চুপ। রাজার চোখ দিয়া টসটস করিয়া জল গড়াইয়া গেল। রাজা ভূতুমের গালে চুমা খাইলেন, বুদ্ধুকে দুই হাত দিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন।

তখনি রাজসভা ভাঙিয়া দিয়া বুদ্ধু আর ভূতুমকে লইয়া রাজা উঠিলেন।

৭

এদিকে তো সাজ-সাজ পড়িয়া গিয়াছে। পাঁচ নিশান উড়াইয়া পাঁচখানা ময়ূরপঙ্খী আসিয়া ঘাটে লাগিল। রাজপুত্রেরা তাহাতে উঠিলেন। রানিরা হুলুধ্বনি দিয়া পাঁচ রাজপুত্রকে কলাবতী রাজকন্যার দেশে পাঠাইলেন।

সেই সময়ে ভূতুম আর বুদ্ধুকে লইয়া রাজা নদীর ঘাটে আসিলেন।

বুদ্ধু বলিল, 'বাবা ও কী যায়?'

রাজা বলিলেন, 'ময়ূরপঙ্খী।'

বুদ্ধু বলিল, 'বাবা, আমরা ময়ূরপঙ্খীতে যাইব, আমাদিগে ময়ূরপঙ্খী দাও।'

রানিরা সকলে কিল্‌কিল্‌ করিয়া উঠিলেন—

'কে লো, কে লো বাঁদির ছানা নাকি লো?

'কে লো, কে লো, ঘুঁটেকুড়ানির ছানা নাকি লো?'

'ও মা, ও মা, ছি! ছি!'

রানিরা ভূতুমের গালে ঠোনা মারিয়া ফেলিয়া দিলেন, বুদ্ধুর গালে চড় মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজা আর কথা কহিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রানিরা রাগে গরগর করিতে করিতে রাজাকে লইয়া রাজপুরীতে চলিয়া গেলেন।

বুদ্ধু বলিল, 'দাদা?'

ভূতুম বলিল, 'ভাই।'

বুদ্ধু : 'চল আমরা ছুতোর বাড়ি যাই, ময়ূরপঙ্খী গড়াইব, রাজপুত্রেরা যেখানে গেল সেইখানে যাইব।'

ভূতুম বলিল, 'চল।'

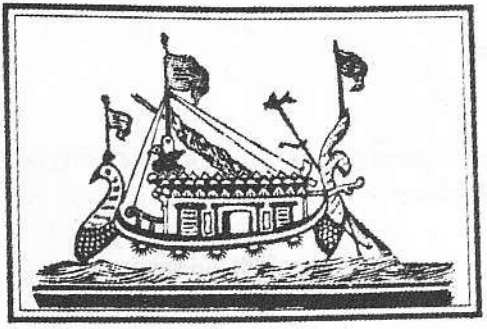

ময়ূরপঙ্খী নৌকা

৮

দিন নাই, রাত্রি নাই, কাঁদিয়া কাটিয়া ভূতুমের মা, বুদ্ধুর মায়ের দিন যায়। তাঁহারাও শুনিলেন রাজপুত্রেরা ময়ূরপঙ্খী করিয়া কলাবতী রাজকন্যার দেশে চলিয়াছেন। শুনিয়া দুইজনে দুইজনের গলা ধরিয়া আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁদিয়া কাটিয়া দুই বোনে শেষে নদীর ধারে আসিলেন। তাহার পরে, দুইজনে দুইখানা সুপারির ডোঙায়—দুইকড়া কড়ি, ধান, দূর্বা আর আগা-গলুইয়ে পাছা-গলুইয়ে সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া ভাসাইয়া দিলেন।

বুদ্ধুর মা বলিলেন—

'বুদ্ধু আমার বাপ
কী করেছি পাপ?
কোন্ পাপে ছেড়ে গেলি, দিয়ে মনস্তাপ?
শুকপঙ্খী নায়ের পাছে ময়ূরপঙ্খী যায়,
আমার বাছা থাকলে যেতিস মায়ের এই নায়।
পৃথিবীর যেখানে যে আছ ভগবান—
আমার বাছার তরে দিলাম এই দূর্বা ধান।'

ভূতুমের মা বলিলেন—

'ভূতুম আমার বাপ!
কী করেছি পাপ?
কোন্ পাপে ছেড়ে গেলি, দিয়ে মনস্তাপ?
শুকপঙ্খী নায়ের পাছে ময়ূরপঙ্খী যায়,
আমার বাছা থাকলে যেতিস মায়ের এই নায়।
পৃথিবীর যেখানে যে আছ ভগবান—
আমার বাছার তরে দিলাম এই দূর্বা ধান।'

সুপারির ডোঙা ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভূতুমের মা, বুদ্ধুর মা কুঁড়েতে ফিরিলেন।

ডোঙা ভাসাইয়া দিলেন

৯

ছুতোরের বাড়ি যাইতে যাইতে পথে ভূতুম আর বুদ্ধু দেখিল, দুইখানি সুপারির ডোঙা ভাসিয়া যাইতেছে।

বুদ্ধু বলিল, 'দাদা, এই তো আমাদের নাও, এই নায়ে উঠ।'

ভূতুম বলিল, 'উঠ।'

তখন বুদ্ধু আর ভূতুম দুইজনে দুই নায়ে উঠিয়া বসিল। দুই ভাইয়ের দুই ময়ূরপঙ্খী পাশাপাশি ভাসিয়া চলিল।

লোকজনে দেখিয়া বলে, 'ও মা! এ আবার কী?'

বুদ্ধু বলে, ভূতুম বলে, 'আমরা বুদ্ধু আর ভূতুম।'

বুদ্ধু, ভূতুম যায়।

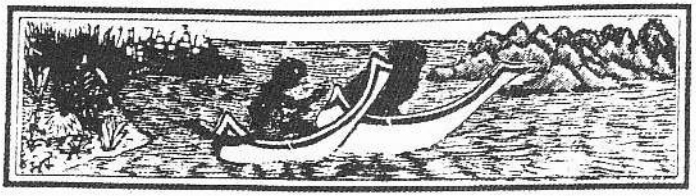

বুদ্ধু আর ভূতুমের ময়ূরপঙ্খী

১০

আর রাজপুত্রেরা? রাজপুত্রদের ময়ূরপঙ্খী যাইতে যাইতে তিন বুড়ির রাজ্যে গিয়া পৌঁছিল। অমনি তিন বুড়ির তিন বুড়া পাইক আসিয়া নৌকা আটকাইল। নৌকা আটকাইয়া তাহারা মাঝি-মাল্লা, সিপাই-লস্কর আর সবসুদ্ধ পাঁচ রাজপুত্রকে থলের মধ্যে পুরিয়া তিন বুড়ির কাছে নিয়া গেল।

তাহাদিগে দিয়া তিন বুড়ি তিন সন্ধ্যা জল খাইয়া, নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল!

অনেক রাত্রে, তিন বুড়ির পেটের মধ্যে হইতে রাজপুত্রেরা বলাবলি করিতে লাগিল, 'ভাই, জন্মের মতো বুড়িদের পেটে রহিলাম। আর মা'দিগে দেখিব না, আর বাবাকে দেখিব না।'

এমন সময় কাহারা আসিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, 'দাদা! দাদা!'

রাজপুত্রেরা চুপি চুপি উত্তর করিল, 'কে ভাই? কে ভাই? আমরা যে বুড়ির পেটে!'

বাহির হইতে উত্তর হইল, 'আমার লেজ ধর; আমার পুচ্ছ ধর।'

রাজপুত্রেরা লেজ ধরিয়া, পুচ্ছ ধরিয়া বুড়িদের নাকের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া আসিল। আসিয়া দেখে বুদ্ধু আর ভূতুম।

বুদ্ধু বলিল, 'চুপ, চুপ! শিগগির তরোয়াল দিয়া বুড়িদের গলা কাটিয়া ফেল।'

রাজপুত্রেরা তাহাই করিলেন। রাজপুত্র, মাল্লা-মাঝি সকলে বাহির হইয়া আসিল। আসিয়া সকলে তাড়াতাড়ি গিয়া ময়ূরপঙ্খীতে পাল তুলিয়া দিল।

বুদ্ধু আর ভূতুমকে কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না।

১১

ময়ূরপঙ্খী সারারাত ছুটিয়া ছুটিয়া ভোরে রাঙা নদীর জলে গিয়া পড়িল। রাঙা নদীর চারিদিকে কূল নাই, কিনারা নাই, কেবল রাঙা জল। মাঝিরা দিক হারাইল, পাঁচ ময়ূরপঙ্খী ঘুরিতে ঘুরিতে সমুদ্রে গিয়া পড়িল। রাজপুত্র, মাল্লা-মাঝি সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল।

সাত দিন, সাত রাত্রি ধরিয়া ময়ূরপঙ্খীগুলি সমুদ্রের মধ্যে আছাড়ি-পিছাড়ি করিল। শেষে নৌকা আর থাকে না, সব যায়-যায়! রাজপুত্রেরা বলিলেন, 'হায় ভাই, বুদ্ধু ভাই থাকিলে আজি এখন রক্ষা করিত!' 'হায় ভাই, ভূতুম ভাই থাকিলে এখন রক্ষা করিত।'

'কী ভাই, কী ভাই!
কী চাই, কী চাই?'

বলিয়া বুদ্ধু আর ভূতুম তাহাদের সুপারির ডোঙা ময়ূরপঙ্খীর গলুইয়ের সঙ্গে বাঁধিয়া থুইয়া, রাজপুত্রদের কাছে আসিল। আর মাঝিদিগে বলিল, 'উত্তর দিকে পাল তুলিয়া দে।'

দেখিতে দেখিতে ময়ূরপঙ্খী সমুদ্র ছাড়াইয়া এক নদীতে আসিয়া পড়িল। নদীর জল যেন টলটল ছলছল করিতেছে। দুই পাড়ে আম-কাঁঠালের হাজার গাছ। রাজপুত্রেরা সকলে পেট ভরিয়া আম, কাঁঠাল খাইয়া সুস্থির হইলেন।

তখন রাজপুত্রেরা বলিলেন, 'ময়ূরপঙ্খীতে বানর আর পেঁচা কেন রে? এ দুইটাকে জলে ফেলিয়া দে।' মাঝিরা বুদ্ধু আর ভূতুমকে জলে ফেলিয়া দিল; তাহাদের সুপারির ডোঙা খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিল। নদীর জলে ময়ূরপঙ্খী আবার চলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া পাঁচটি ময়ূরপঙ্খীই রাজপুত্র, মাল্লা-মাঝি সব লইয়া ভুস করিয়া ডুবিয়া গেল। আর তাহাদের কোনো চিহ্নই রহিল না।

কতক্ষণ পর বুদ্ধু আর ভূতুমের ডোঙা সেইখানে আসিল। বুদ্ধু বলিল, 'দাদা!'

ভূতুম বলিল, 'কী?'

বুদ্ধু : 'আমার মন যেন কেমন কেমন করে, এইখানে কী যেন হইয়াছে। এসো তো, ডুব দিয়া দেখি।'

ভূতুম বলিল, 'হোক-গে! ওরা মরিয়া গেলেই বাঁচি। আমি ডুব টুব দিতে পারিব না।'

বুদ্ধু বলিল, 'ছি, ছি, অমন কথা বলিও না। তা, তুমি থাকো; এই আমার কোমরে সূতা বাঁধিলাম, যতদিন সূতাতে টান না দিব, ততদিন যেন তুলিও না।'

ভূতুম বলিল, 'আচ্ছা, তা পারি।'

তখন বুদ্ধু নদীর জলে ডুব দিল, ভূতুম সূতা ধরিয়া বসিয়া রহিল।

১২

যাইতে যাইতে বুদ্ধু পাতালপুরিতে গিয়া দেখিল, এক মস্ত সুড়ঙ্গ। বুদ্ধু সুড়ঙ্গ দিয়া নামিল।

সুড়ঙ্গ পার হইয়া বুদ্ধু দেখিল, এক যে—রাজপুরি!—যেন ইন্দ্রপুরির মতো!

কিন্তু সে রাজ্যে মানুষ নাই, জন নাই, কেবল এক একশো বচ্ছুরে বুড়ি বসিয়া একটি ছোট কাঁথা সেলাই করিতেছে। বুড়ি বুদ্ধুকে দেখিয়াই হাতের কাঁথা বুদ্ধুর গায়ে ছুড়িয়া মারিল। অমনি হাজার হাজার সিপাই আসিয়া বুদ্ধুকে বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাজপুরির মধ্যে লইয়া গেল।

নিয়া গিয়া, সিপাহিরা এক অন্ধকুঠরির মধ্যে বুদ্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। অমনি কুঠরির মধ্যে— 'বুদ্ধু ভাই, বুদ্ধু ভাই, আয় ভাই, আয় ভাই।' বলিয়া অনেক লোক বুদ্ধুকে ঘিরিয়া ধরিল। বুদ্ধু দেখিল, রাজপুত্র আর মাল্লা-মাঝিরা!

বুদ্ধু বলিল, 'বটে! তা, আচ্ছা!'

পরদিন বুদ্ধু দাঁতমুখ সিটকাইয়া মরিয়া রহিল! এক দাসি রাজপুত্রদিগে নিত্য কি-না খাবার দিয়া যাইত! সে আসিয়া দেখে কুঠরির মধ্যে একটা বানর মরিয়া পড়িয়া আছে। সে যাইবার সময় মরা বানরটাকে ফেলিয়া দিয়া গেল।

আর কী? তখন বুদ্ধু আস্তে আস্তে চোখ মিটিমিটি করিয়া উঠে। না, তো, এদিক-ওদিক চাহিয়া বুদ্ধু উঠিল। উঠিয়াই বুদ্ধু দেখিল প্রকাণ্ড রাজপুরির তেতলায় মেঘবরণ চুল কুঁচবরণ কন্যা সোনার শুকের সঙ্গে কথা কহিতেছে।

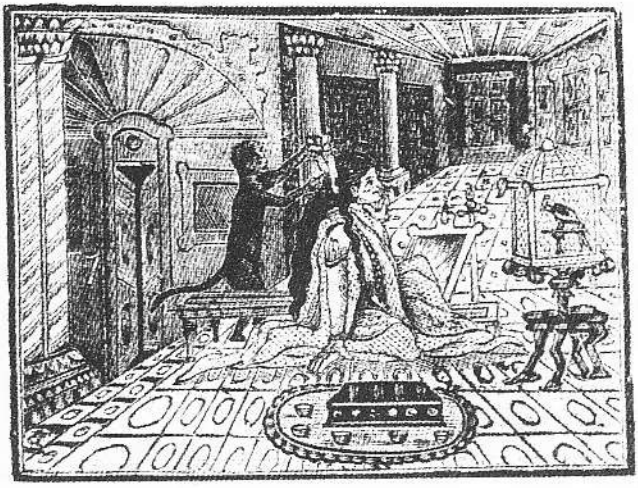

কী হইল কন্যা, মোতির ফুল?

বুদ্ধু গাছের ডালে-ডালে, দালানের ছাদে ছাদে গিয়া, কুঁচবরণ কন্যার পিছনে দাঁড়াইল। তখন কুঁচবরণ কন্যা বলিতেছিলেন—

'সোনার পাখি, ও রে শুক, মিছাই গেল
রুপার বৈঠা হীরার হাল—কেউ না এল!'

রাজকন্যার খোঁপায় মোতির ফুল ছিল, বুদ্ধু আস্তে মোতির ফুলটি উঠাইয়া লইল। তখন শুক বলিল—

'কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল,
কী হইল কন্যা, মোতির ফুল?'

রাজকন্যা খোঁপায় হাত দিয়া দেখিলেন, ফুল নাই। শুক বলিল—

'কলাবতী রাজকন্যা, চিন্তা নাকো আর,
মাথা তুলে চেয়ে দেখ, বর তোমার!'

কলাবতী চমকিয়া পিছন ফিরিয়া দেখেন—বানর! কলাবতীর মাথা হেঁট হইল। হাতের কাঁকন ছুড়িয়া ফেলিয়া, মেঘবরণ চুলের বেণি এলাইয়া দিয়া কলাবতী রাজকন্যা মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

কিন্তু রাজকন্যা কী করিবেন? যখন পণ করিয়াছিলেন যে, তিন বুড়ির রাজ্য পার হইয়া, রাঙা নদীর জল পাড়ি দিয়া, কাঁথা-বুড়ির আর অন্ধকুঠরির হাত এড়াইয়া তাঁহার পুরিতে আসিয়া যে মোতির ফুল নিতে পারিবে, সে-ই তাঁহার স্বামী হইবে। তখন রাজকন্যা আর কী করেন? উঠিয়া বানরের গলায় মালা দিলেন।

তখন বুদ্ধু হাসিয়া বলিল, 'রাজকন্যা, এখন তুমি কার?'

রাজকন্যা বলিলেন, 'আগে ছিলাম বাপের-মায়ের তারপরে ছিলাম আমার। এখন তোমার।'

বুদ্ধু বলিল, 'তবে আমার দাদাদিগে ছাড়িয়া দাও। আর তুমি আমার সঙ্গে বাড়ি চল, মা-দের বড় কষ্ট, তুমি গেলে তাহাদের কষ্ট থাকিবে না।'

রাজকন্যা বলিলেন, 'এখন তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। তা চল, কিন্তু তুমি আমাকে এমনি নিতে পারিবে না। আমি এই কৌটার মধ্যে থাকি, তুমি কৌটায় করিয়া আমাকে লইয়া চল।'

বুদ্ধু বলিল, 'আচ্ছা।'

রাজকন্যা কৌটার ভিতর উঠিলেন।

অমনি শুকপাখি তাড়াতাড়ি গিয়া ঢোল-ডগরে ঘা দিল। দেখিতে দেখিতে রাজপুরির মধ্যে এক প্রকাণ্ড হাটবাজার বসিয়া গেল। রাজকন্যার কৌটা দোকানির কৌটার সঙ্গে মিশিয়া গেল।

বুদ্ধু দেখিল, এ তো বেশ। সে ঢোল-ডগর লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। ডোল-ডগরের ডাহিনে ঘা দিলে হাটবাজার বসে, বাঁয়ে ঘা দিলে হাটবাজার ভাঙিয়া যায়। বুদ্ধু চোখ বুজিয়া বসিয়া বসিয়া বাজাইতে লাগিল। দোকানিরা দোকান উঠাইতে-নামাইতে, উঠাইতে-নামাইতে একেবারে হয়রান হইয়া গেল, আর পারে না। তখন সকলে বলিল, 'রাখুন, রাখুন, রাজকন্যার কৌটা নেন ; আমরা আর হাট করিতে চাহি না।'

বুদ্ধু ঢোল-ডগরের বাঁয়ে ঘা মারিল, হাট ভাঙিয়া গেল। কেবল রাজকন্যার কৌটাটি পড়িয়া রহিল।

বুদ্ধু এবার আর কিন্তু ঢোলটি ছাড়িল না। ঢোলটি কাঁধে করিয়া কৌটার কাছে গিয়া ডাকিল,

'রাজকন্যা রাজকন্যা, ঘুমে আছ কি?
বরে নিতে ঢোল-ডগর নিয়ে এসেছি।'

রাজকন্যা কৌটা হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, 'আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, গাছের-পাতার-ফল আনিয়া দাও, খাইব।'

বুদ্ধু বলিল, 'আচ্ছা।'

রাজকন্যা কৌটায় উঠিলেন। বুদ্ধু ঢোল কাঁধে কৌটা হাতে গাছের-পাতার-ফল আনিতে চলিল।

সেখানে গিয়া বুদ্ধু দেখিল, গাছের পাতায়-পাতায় কতরকম ফল ধরিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া বুদ্ধুরও বড় লোভ হইল! কিন্তু ও বাবা। এক যে অজগর—গাছের গোড়ায় শোঁ-শোঁ করিয়া শোঁসাইতেছে!

বুদ্ধু তখন আস্তে আস্তে গাছের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিয়া, এক দৌড় দিল। তাহার কোমরের সূতায় জড়াইয়া অজগর কাটিয়া দুইখান হইয়া গেল। তখন বুদ্ধু গাছে উঠিয়া, পাতার ফল পাড়িয়া, রাজকন্যাকে ডাকিল।

রাজকন্যা বলিলেন, 'আর না, সব হইয়াছে।...এখন চল, তোমার বাড়ি যাইব।'

বুদ্ধু বলিল, **'না, সব হয় নাই** ; রাজপুত্রদিগে আর বুড়ির কাঁথাটি লইতে হইবে।'

রাজকন্যা বলিলেন, 'লও।'

তখন পাঁচ রাজপুত্র, মাল্লা-মাঝি, ময়ূরপঙ্খী—সব লইয়া, ঢোল-ডগর কাঁধে, কৌটা হাতে, মোতির ফুল কানে, বুড়ির কাঁথা গায়ে বুদ্ধু গাছের-পাতার-ফল খাইতে খাইতে কোমরের সূতায় টান দিল।

ভূতুম বুঝিল এইবার বুদ্ধু আসিতেছে। সে সূতা টানিয়া তুলিল। পাঁচ রাজপুত্র, সিপাই-লস্কর, মাল্লা-মাঝি, ময়ূরপঙ্খী—সব লইয়া বুদ্ধু ভাসিয়া উঠিল।

ভাসিয়া উঠিয়া মাল্লা-মাঝিরা, 'সার্ সার্' করিয়া পাল তুলিয়া দিল। বুদ্ধু গিয়া ময়ূরপঙ্খীর ছাদে বসিল, পেঁচা গিয়া ময়ূরপঙ্খীর মাস্তুলে বসিল।

এবার সকলকে লইয়া ময়ূরপঙ্খী দেশে চলিল।

ছাদের উপর বুদ্ধু চোখ মিটিমিটি করে আর মাঝে-মাঝে কৌটা খুলিয়া কাহার সঙ্গে যেন কথা কয়—হালের মাঝি, যে, রাজপুত্রদিগে এই খবর দিল।

খবর পাইয়া তাহারা চুপ। .... রাত্রে সকলে ঘুমাইয়াছে, ভূতুম আর বুদ্ধুও ঘুমাইতেছে; সেই সময়, রাজপুত্রেরা চুপিচুপি আসিয়া কৌটাটি সরাইয়া লইয়া, ঢোল-ডগর শিয়রে, বুড়ির কাঁথা-গায়ে বুদ্ধুকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। ভূতুম, মাস্তুলে ছিল, তার বুকে তীর মারিলেন। বুদ্ধু, ভূতুম, জলে পড়িয়া ভাসিয়া গেল।

তখন কৌটা খুলিতেই, মেঘবরণ চুল কুঁচবরণ রাজকন্যা বাহির হইলেন।

রাজপুত্রেরা বলিলেন, 'রাজকন্যা, এখন তুমি কার?'

রাজকন্যা বলিলেন, 'ঢোল-ডগর যার।'

শুনিয়া রাজপুত্রেরা বলিলেন, 'ও! তা বুঝিয়াছি! রাজকন্যাকে আটক কর।'

কী করিবেন? রাজকন্যা ময়ূরপঙ্খীর এক কুঠরির মধ্যে আটক হইয়া রহিলেন।

১৩

রহিলেন—ময়ূরপঙ্খী আসিয়া ঘাটে লাগিল, আর রাজ্যময় সাজ-সাজ পড়িয়া গেল। রাজা আসিলেন, রানিরা আসিলেন, রাজ্যের সকলে নদীর ধারে আসিল। মেঘবরণ চুল কুঁচবরণ কন্যা লইয়া রাজপুত্রেরা আসিয়াছেন।

রানিরা ধান-দূর্বা দিয়া, পঞ্চদীপ সাজাইয়া, শাঁখ-শঙ্খ বাজাইয়া কলাবতী রাজকন্যাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

রানিরা বলিলেন—'রাজকন্যা, তুমি কার?'

রাজকন্যা বলিলেন,—'ঢোল-ডগর যা'র।'

'ঢোল-ডগর হীরারাজপুত্রের?'

'না।'

'ঢোল-ডগর মানিকরাজপুত্রের?'

'না।'

'ঢোল-ডগর মতিরাজপুত্রের?'

'না।'

'ঢোল-ডগর শঙ্খরাজপুত্রের?'

'না।'

'ঢোল-ডগর কাঞ্চনরাজপুত্রের?'

'না।'

রানিরা বলিলেন, 'তবে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।'

রাজকন্যা বলিলেন, 'আমার একমাস ব্রত, একমাস পরে যাহা ইচ্ছা করিও।'

তাহাই ঠিক হইল।

১৪

ভূতুমের মা, বুদ্ধুর মা, এতদিন কাঁদিয়া-কাঁদিয়া মর-মর। শেষে দুইজনে নদীর জলে ডুবিয়া মরিতে গেলেন।

এমন সময় একদিক হইতে বুদ্ধু ডাকিল, 'মা!'
আর একদিক হইতে ভূতুম ডাকিল, 'মা!'
দীন-দুঃখিনী দুই মায়ে ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন—

বুকের ধন হারামনি বুদ্ধু আসিয়াছে!
বুকের ধন হারামনি ভূতুম্ আসিয়াছে!

বুদ্ধুর মা, ভূতুমের মা, পাগলের মতো হইয়া ছুটিয়া গিয়া দুইজনে দুইজনকে বুকে নিলেন। বুদ্ধু-ভূতুমের চোখের জলে, তাঁহাদের চোখের জলে, পৃথিবী ভাসিয়া গেল।

বুদ্ধু ভূতুম্ কুঁড়েয় গেল।

পরদিন, সেই যে ঢোল-ডগর ছিল! চিড়িয়াখানার বাঁদি, ঘুঁটেকুড়ানি দাসির কুঁড়ের কাছে, মস্ত হাটবাজার বসিয়া গিয়াছে। দেখিয়া লোক অবাক হইয়া গেল।

তাহার পরদিন, চিড়িয়াখানার বাঁদি, ঘুঁটেকুড়ানি দাসির কুঁড়ের চারিদিকে গাছের পাতায় পাতায় ফল ধরিয়াছে! দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল।

তাহার পরদিন, চিড়িয়াখানার বাদি, ঘুঁটেকুড়ানি দাসির কুঁড়ে ঘিরিয়া লক্ষ সিপাই পাহারা দিতেছে! দেখিয়া লোক সকল চমকিয়া গেল।

সেই খবর যে, রাজার কাছে গেল।

যাইতেই, সেইদিন কলাবতী রাজকন্যা বলিলেন, 'মহারাজ, আমার ব্রতের দিন শেষ হইয়াছে; আমাকে মারিবেন, কি কাটিবেন, কাটুন।' শুনিয়া রাজার চোখ ফুটিল। রাজা সব বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া রাজা বলিলেন, 'মা, আমি সব বুঝিয়াছি। কে আমার আছ, ন-রানিকে আর ছোটরানিকে ঢোল-ডগর বাজাইয়া ঘরে আনো।'

অমনি রাজপুরীর যত ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল। কলাবতী রাজকন্যা, নূতন জলে স্নান, নূতন কাপড়ে পরণ, ব্রতের ধান-দূর্বা মাথায় গুঁজিয়া, দুই রানিকে বরণ করিয়া আনিতে আপনি গেলেন।

শুনিয়া, পাঁচ রানি ঘরে গিয়া খিল দিলেন। পাঁচ রাজপুত্র ঘরে গিয়া কবাট দিলেন।

লক্ষ সিপাই লইয়া, ঢোল-ডগর বাজাইয়া ন-রানি, ছোটরানিকে নিয়া কলাবতী রাজকন্যা রাজপুরিতে ফিরিয়া আসিলেন। বুদ্ধু ভূতুম আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিল।

পরদিন মহাধূমধামে মেঘবরণ চুল কুঁচবরণ কলাবতী রাজকন্যার সঙ্গে বুদ্ধুর বিবাহ হইল। আর-এক দেশের রাজকন্যা হীরাবতীর সঙ্গে ভূতুমের বিবাহ হইল।

পাঁচ রানিরা আর খিল খুলিলেন না। পাঁচ রাজপুত্রেরা আর কবাট খুলিলেন না! রাজা পাঁচ রানির আর পাঁচ রাজপুত্রের ঘরের উপরে কাঁটা দিয়া, মাটি দিয়া, বুজাইয়া দিলেন।

ক'দিন যায়। একদিন রাত্রে—বুদ্ধুর ঘরে বুদ্ধু, ভূতুমের ঘরে ভূতুম; কলাবতী রাজকন্যা, হীরাবতী রাজকন্যা ঘুমে। খু-ব রাত্রে হীরাবতী, কলাবতী উঠিয়া দেখেন—একী! হীরাবতীর ঘরে তো সোয়ামি নাই! কলাবতীর ঘরেও তো সোয়ামি নাই! কী হইল, কী হইল? দেখেন, বিছানার উপরে এক বানরের ছাল, বিছানার উপরে এক পেঁচার পাখ!!

'অ্যাঁ—দ্যাখ্! তবে তো এঁরা সত্যিকারের বানর না, সত্যিকারের পেঁচা না।'—দুই বোনে ভাবেন। নানান খানান ভাবিয়া শেষে উঁকি দিয়া দেখেন—দুই রাজপুত্র ঘোড়ায় চাপিয়া রাজপুরি পাহারা দেয়। রাজপুত্রেরা যে, দেবতার পুত্রের মতো সুন্দর!

তখন দুই বোনে যুক্তি করিয়া তাড়াতাড়ি পেঁচার পাখ, বানরের ছাল প্রদীপের আগুনে পোড়াইয়া ফেলিলেন। পোড়াইতেই—গন্ধ!

গন্ধ পাইয়া দুই রাজপুত্র ঘোড়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। ছুটিয়া আসিয়া দেবকুমার দুই রাজপুত্র বলেন, 'সর্বনাশ, সর্বনাশ! এ কী করলে! সন্ন্যাসীর মন্ত্র ছিল, ছদ্মবেশে থাকিতাম, দেবপুরে যাইতাম-আসিতাম, রাজপুরে পাহারা দিতাম, আর তো সে-সব করিতে পারিব না! এখন, আর তো আমরা বানর-পেঁচা হইয়া থাকিতে পারিব না! —কথা যে, প্রকাশ হইল!'

দুই রাজকন্যা ছিলেন থতমত, হাসিয়া বলিলেন, 'তার আর কী? তবে তো ভালোই, তবে তো বেশ হইল। ও মা, তবে না-কি পেঁচা? তবে না-কি বানর? আমরা কোথায় যাই!'

দুই রাজকন্যার ঘরে, আর কী? সুখের নিশি, সুখের হাট। তার পরদিন ভোরে উঠিয়া সকলে দেখে, দেবতার মতো মূর্তি দুই সোনার চাঁদ রাজপুত্র রাজার দুই পাশে বসিয়া আছে! দেখিয়া সকল লোকে চমৎকার মানিল।

কলাবতী রাজকন্যা বলিলেন, 'উনি বানরের ছাল গায়ে দিয়া থাকিতেন; কাল রাত্রে আমি তাহা পোড়াইয়া ফেলিয়াছি।'

আর-একদেশের রাজকন্যা হীরাবতী বলিলেন, 'উনি পেঁচার পাখ গায়ে দিয়া থাকিতেন, কাল আমি তাহা পোড়াইয়া ফেলিয়াছি।'

শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিল।
তারপর? তারপর?—

বুদ্ধুর নাম হইয়াছে —**বুধকুমার**।
ভূতুমের নাম হইয়াছে —**রূপকুমার**।
রাজ্যে আনন্দের জয়-জয়কার পড়িয়া গেল।

তাহার পর—ন-রানি, ছোটরানি, বুধকুমার, রূপকুমার আর কলাবতী রাজকন্যা হীরাবতী রাজকন্যা লইয়া রাজা সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

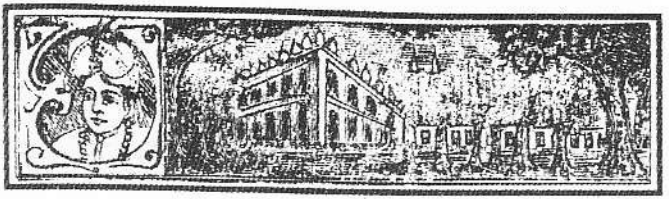

ঘুমন্ত পুরি

১

এক দেশের এক রাজপুত্র। রাজপুত্রের রূপে রাজপুরি আলো। রাজপুত্রের গুণের কথা লোকের মুখে ধরে না।

একদিন রাজপুত্রের মনে হইল, দেশভ্রমণে যাইবেন। রাজ্যের লোকের মুখ ভার হইল, রানি আহার-নিদ্রা ছাড়িলেন, কেবল রাজা বলিলেন—'আচ্ছা, যাক।'

তখন দেশের লোক দলে-দলে সাজিল,

রাজা চর-অনুচর দিলেন,
রানি মণি-মাণিক্যের ডালা লইয়া আসিলেন।

রাজপুত্র লোকজন, মণি-মাণিক্য চর-অনুচর কিছুই সঙ্গে নিলেন না। নূতন পোশাক পরিয়া, নূতন তরোয়াল ঝুলাইয়া রাজপুত্র দেশভ্রমণে বাহির হইলেন।

২

যাইতে যাইতে, যাইতে যাইতে, কত দেশ, কত পর্বত, কত নদী, কত রাজার রাজ্য ছাড়াইয়া, রাজপুত্র এক বনের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন! দেখেন, বনে পাখপাখালির শব্দ নাই, বাঘ-ভালুকের সাড়া নাই! —রাজপুত্র চলিতে লাগিলেন!

চলিতে চলিতে, অনেক দূর গিয়া রাজপুত্র দেখেন, বনের মধ্যে এক যে রাজপুরি—রাজপুরির সীমা নাই। অমন রাজপুরি রাজপুত্র আর কখনো দেখেন নাই! দেখিয়া রাজপুত্র অবাক হইয়া রহিলেন।

রাজপুরির ফটকের চূড়া আকাশে ঠেকিয়াছে। ফটকের দুয়ার বন জুড়িয়া আছে। কিন্তু ফটকের চূড়ায় বাদ্য বাজে না, ফটকের দুয়ারে দুয়ারী নাই।

রাজপুত্র আস্তে আস্তে রাজপুরির মধ্যে গেলেন।

রাজপুরির মধ্যে গিয়া দেখেন—পুরি যে পরিষ্কার, যেন দুধে ধোয়া, ধব ধব করিতেছে। কিন্তু এমন পুরির মধ্যে জনমানুষ নাই, কোনোকিছুর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, পুরি নিভাঁজ, নিঝুম— পাতাটি পড়ে না, কুটাটুকু নড়ে না।

রাজপুত্র আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

রাজপুত্র এদিক দেখেন, ওদিক দেখেন, পুরির চারিদিক দেখিতে লাগিলেন।

একখানে গিয়া রাজপুত্র থমকিয়া গেলেন! দেখেন মস্ত আঙিনা—আঙিনা জুড়িয়া হাতি, ঘোড়া, সেপাই, লস্কর, দুয়ারী, পাহারা, সৈন্য, সামন্ত সব সারি-সারি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!

রাজপুত্র হাঁক দিলেন!
কেহ কথা কহিল না।
কেহ তাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখিল না।

অবাক হইয়া রাজপুত্র কাছে গিয়া দেখেন—কাতারে কাতারে সিপাই, লস্কর; কাতারে কাতারে হাতি-ঘোড়া সব পাথরের মূর্তি হইয়া রহিয়াছে। কাহারও চক্ষে পলক পড়ে না। কাহারও গায়ে চুল নড়ে না। রাজপুত্র আশ্চর্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন রাজপুত্র পুরির মধ্যে গেলেন।

এক কুঠরিতে গিয়ে দেখেন, কুঠরির মধ্যে কত রকমের ঢাল-তরোয়াল, তীর-ধনুক সব হাজারে হাজারে টানানো রহিয়াছে। পাহারারা পাথরের মূর্তি, সিপাইরা পাথরের মূর্তি। রাজপুত্র আপনার তরোয়াল খুলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলেন।

আর এক কুঠুরিতে গিয়া দেখেন—মস্ত রাজদরবার। রাজদরবারে সোনার প্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বলজ্বল করিতেছে, চারিদিকে মণিমাণিক্য ঝকঝক করিতেছে। কিন্তু রাজসিংহাসনে রাজা পাথরমূর্তি, মন্ত্রীর আসনে মন্ত্রী পাথরমূর্তি; পাত্র-মিত্র, ভাট-বন্দি, সিপাই-লস্কর যে যেখানে, সে সেখানে পাথরমূর্তি। কাহারো চক্ষে পলক নাই, কাহারো মুখে কথা নাই।

রাজপুত্র দেখেন—রাজার মাথায় রাজছত্র হেলিয়া আছে, দাসির হাতে চামর ঢুলিয়া আছে—সাড়া নাই, শব্দ নাই, সব ঘুমে নিঝুম। রাজপুত্র মাথা নোয়াইয়া চলিয়া আসিলেন।

আর এক কুঠরিতে গিয়া দেখেন, যেন কত শত প্রদীপ একসঙ্গে জ্বলিতেছে—কত রকমের ধনরত্ন, কত হীরা, কত মানিক, কত মোতি— কুঠরিতে আর ধরে না। রাজপুত্র কিছু ছুঁইলেন না, দেখিয়া আর-এক কুঠরিতে চলিয়া গেলেন।

সে কুঠরিতে যাইতে-না-যাইতে হাজার হাজার ফুলের গন্ধে রাজপুত্র বিভোর হইয়া উঠিলেন। কোথা হইতে এমন ফুলের গন্ধ আসে? রাজপুত্র কুঠরির মধ্যে গিয়া দেখেন—জল নাই টল নাই, কুঠরির মাঝখানে লাখে লাখে পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে! পদ্মফুলে গন্ধে ঘর ম-ম করিতেছে। রাজপুত্র ধীরে ধীরে ফুলবনের কাছে গেলেন।

ফুলবনের কাছে গিয়া রাজপুত্র দেখেন—ফুলের বনে সোনার খাট, সোনার খাটে হীরার ডাঁট, হীরার ডাঁটে ফুলের মালা দোলানো রহিয়াছে; সেই মালার নিচে, হীরের নালে সোনার পদ্ম, সোনার পদ্মে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা বিভোরে ঘুমাইতেছেন। ঘুমন্ত রাজকন্যার হাত দেখা যায় না, পা দেখা যায় না, কেবল চাঁদের-কিরণ মুখখানি সোনার পদ্মের সোনার পাপড়ির মধ্যে টুলটুল্ করিতেছে। রাজপুত্র মোতির ঝালর হীরার ডাঁটে ভর দিয়া, অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

৩

দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে কত বচ্ছর চলিয়া গেল। রাজকন্যার আর ঘুম ভাঙে না, রাজপুত্রের চক্ষে আর পলক পড়ে না। রাজকন্যা অঘোরে ঘুমাইতেছেন, রাজপুত্র বিভোর হইয়া দেখিতেছেন।

* * * * *

হঠাৎ একদিন রাজপুত্র দেখেন, রাজকন্যার শিয়রে এক সোনার কাঠি! রাজপুত্র আস্তে আস্তে সোনার কাঠি তুলিয়া লইলেন।

সোনার কাঠি তুলিয়া লইতেই দেখেন, আর-এক দিকে এক রুপার কাঠি। রাজপুত্র আশ্চর্য হইয়া রুপার কাঠিও তুলিয়া লইলেন। দুই কাঠি হাতে লইয়া রাজপুত্র নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে, সোনার কাঠিটি কখন টুক করিয়া ঘুমন্ত রাজকন্যার মাথায় ছুঁইয়া গেল! অমনি পদ্মের বন 'শিউরে' উঠিল, সোনার খাট নড়িয়া উঠিল, সোনার পাপড়ি ঝরিয়া পড়িল, রাজকন্যার হাত হইল, পা হইল; গায়ের আলস ভাঙিয়া, চোখের পাতা কচলাইয়া ঘুমন্ত রাজকন্যা চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন।

আর অমনি রাজপুরির চারিদিকে পাখি ডাকিয়া উঠিল, দুয়ারে দুয়ারী আসিয়া হাঁক ছাড়িল, উঠানে হাতি-ঘোড়া ডাক ছাড়িল, সিপাইয়ের তরোয়াল ঝনঝন করিয়া উঠিল, রাজদরবারে রাজা জাগিলেন, মন্ত্রী জাগিলেন, পাত্র জাগিলেন—হাজার বচ্ছরের ঘুম হইতে, যে যেখানে ছিলেন জাগিয়া উঠিলেন—লোক-লস্কর, সিপাই-পাহারা সৈন্য-সামন্ত তীর-তরোয়াল লইয়া খাড়া হইল। সকলে অবাক হইয়া গেলেন, রাজপুরিতে কে আসিল!

রাজপুত্র অবাক হইয়া গেলেন।

রাজকন্যা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাজা, মন্ত্রী, জন-পরিজন সকলে আসিয়া দেখেন—রাজপুত্র-রাজকন্যা মাথা নামাইলেন। রাজপুরির চারিদিকে ঢাক-ঢোল, শানাই-নাকাড়া বাজিয়া উঠিল।

রাজা বলিলেন, 'তুমি কোন্ দেশের ভাগ্যবান রাজার রাজপুত্র, আমাদিগকে মরণ-ঘুমের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছ!'

জন-পরিজনেরা বলিল, 'আহা! আপনি কোন্ দেবতা-রাজার দেব-রাজপুত্র—এক দৈত্য রুপার কাঠি ছোঁয়াইয়া আমাদের গমগমা সোনার রাজ্য ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল। আপনি আসিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া রক্ষা করিলেন।

রাজপুত্র মাথা নোয়াইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, 'আমার কী আছে, কী দিব? এই রাজকন্যা তোমার হাতে দিলাম, এই রাজত্ব তোমাকে দিলাম।'

চারিদিকে ফুল-বৃষ্টি, চারিদিকে চন্দন-বৃষ্টি; ফুল ফোটে, খই ছোটে; রাজপুরির হাজার ঢোলে 'ডুম্-ডুম্' কাঠি পড়িল।

তখন শতে শতে বাঁদি-দাসি বাটনা বাটে, হাজারে হাজারে ধাই দাসি কুটনা কোটে :

দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গল ঘড়া
পাঁচ পল্লব ফুলের তোড়া;
আলপনা বিলিপনা, এয়োর ঝাঁক,
পাঠ-পীড়ি আসন ঘিরে, বেজে ওঠে শাঁখ।

সে কী শোভা! রাজপুরির চার-চত্বর দলদল ঝলমল। আঙিনায় আঙিনায় হুলুধ্বনি, রাজভাণ্ডারে ছাড়াছড়ি, জন-জনতার হুড়াহুড়ি—এতদিনের ঘুমন্ত রাজপুরি দাপে কাঁপে, আনন্দে তোলপাড়।

তাহার পর, ফুটফুটে চাঁদের আলোয় আগুন-পুরুত সম্মুখে, গুয়া-পান, রাজ-রাজত্ব যৌতুক দিয়া, রাজা পঞ্চরত্ন মুকুট পরাইয়া রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিলেন।

চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল।

৪

এক বছর, দু বছর, বছরের পর কত বছর গেল—দেশভ্রমণে গিয়াছেন রাজপুত্র, আজও ফিরেন না। কাঁদিয়া কাটিয়া, মাথা খুঁড়িয়া রানি বিছানা নিয়াছেন। ভাবিয়া ভাবিয়া, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে রাজা অন্ধ হইয়াছেন। রাজ্য অন্ধকার, রাজ্যে হাহাকার।

একদিন ভোর হইতে-না-হইতে রাজদুয়ারে ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিল, হাতি-ঘোড়া সিপাই-সান্ত্রীর হাঁকে দুয়ার কাঁপিয়া উঠিল!

রানি বলিলেন, 'কী, কী?'

রাজা বলিলেন, 'কে, কে?'

রাজ্যের প্রজারা ছুটিয়া আসিল। রাজপুত্র—রাজকন্যা বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন!

কাঁপিতে কাঁপিতে রাজা আসিয়া রাজপুত্রকে বুকে লইলেন। পড়িতে পড়িতে রানি আসিয়া রাজকন্যাকে বরণ করিয়া নিলেন।

প্রজারা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

রাজপুত্র রাজার চোখে সোনার কাঠি ছোঁয়াইলেন, রাজার চোখ ভালো হইল। ছেলেকে পাইয়া, ছেলের বউ দেখিয়া রানির অসুখ সারিয়া গেল।

তখন, রাজপুত্র লইয়া, ঘুমন্তপুরির রাজকন্যা লইয়া, রাজা-রানি সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র আর রাখাল

কাঁকনমালা
কাঞ্চনমালা

১

ক রাজপুত্র আর এক রাখাল—দুইজনে বন্ধু। রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন, যখন তিনি রাজা হইবেন, রাখাল-বন্ধুকে তাঁহার মন্ত্রী করিবেন।

রাখাল বলিল, 'আচ্ছা।'

দুইজনে মনের সুখে থাকেন। রাখাল মাঠে গরু চরাইয়া আসে, দুই বন্ধুতে গলাগলি হইয়া গাছতলে বসেন। রাখাল বাঁশি বাজায়, রাজপুত্র শোনেন। এইরূপে দিন যায়।

২

রাজপুত্র রাজা হইলেন। রাজা রাজপুত্রের কাঞ্চনমালা রানি, ভাণ্ডার ভরা মানিক—কোথাকার রাখাল, সে আবার বন্ধু! রাজপুত্রের রাখালের কথা মনেই রহিল না।

একদিন রাখাল আসিয়া রাজদুয়ারে ধরনা দিল— 'বন্ধুর রানি কেমন, দেখাইল না।' দুয়ারী তাহাকে 'দূর, দূর' করিয়া খেদাইয়া দিল। মনের কষ্টে রাখাল কোথায় গেল, কেহই জানিল না।

৩

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া রাজা চোখ মেলিতে পারেন না। কী হইল, কী হইল? রানি দেখেন, সকলে দেখে—রাজার মুখ-ময় সূঁচ, গা-ময় সূঁচ, মাথার চুল পর্যন্ত সূঁচ হইয়া গিয়াছে। এ কী হইল! রাজপুরিতে কান্নাকাটি পড়িল।

রাজা খাইতে পারেন না, শুইতে পারেন না, কথা কহিতে পারেন না। রাজা মনে মনে বুঝিলেন—রাখাল-বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়াছি, সেই পাপে এ-দশা হইল। কিন্তু মনের কথা কাহাকেও বলিতে পারেন না।

সুঁচরাজার রাজসংসার অচল হইল—সুঁচরাজা মনের দুঃখে মাথা নামাইয়া বসিয়া থাকেন; রানি কাঞ্চনমালা দুঃখে-কষ্টে কোনোরকমে রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন।

৪

একদিন রানি নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন, কাহার এক পরমাসুন্দরী মেয়ে আসিয়া বলিল, 'রানি যদি দাসি কিনেন, তো আমি দাসি হইব। রানি বলিলেন, 'সুঁচরাজার সুঁচ খুলিয়া দিতে পার তো আমি দাসি কিনি।'

দাসি স্বীকার করিল।
তখন রানি হাতের কাঁকন দিয়া দাসি কিনিলেন।

দাসি বলিল, 'রানিমা, তুমি বড় কাহিল হইয়াছ; কতদিন না-জানি ভালো করিয়া খাও না, নাও না। গায়ের গহনা ঢিলা হইয়াছে, মাথার চুল জটা দিয়াছে। তুমি গহনা খুলিয়া রাখ, বেশ করিয়া ক্ষার-খৈল দিয়া স্নান করাইয়া দেই।'

রানি বলিলেন, 'না মা, কী আর স্নান করিব—থাক্।'

দাসি তাহা শুনিল না; রানির গায়ের গহনা খুলিয়া ক্ষার-খৈল মাখাইয়া দিল। দিয়া বলিল, 'মা, এখন ডুব দাও।'

রানি গলা-জলে নামিয়া ডুব দিলেন, দাসি চক্ষের পলকে রানির কাপড় পরিয়া, রানির গহনা গায়ে দিয়া ঘাটের উপর উঠিয়া ডাকিল—

'দাসি লো দাসি পান্-কৌ।
ঘাটের উপর রাঙা বৌ!
রাজার রানি কাঁকনমালা—
ডুব দিবি আর কত বেলা?'

রানি ডুব দিয়া উঠিয়া দেখেন, দাসি রানি হইয়াছে, তিনি বাঁদি হইয়াছেন। রানি কপালে চড় মারিয়া ভিজা চুলে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁকনমালার সঙ্গে চলিলেন।

৫

রাজপুরিতে গিয়া কাঁকনমালা পুরি মাথায় করিল। মন্ত্রীকে বলে, 'আমি নাইয়া আসিতেছি, হাতি-ঘোড়া সাজাও নাই কেন?' পাত্রকে বলে, 'আমি নাইয়া আসিব, দোল-চৌদোলা পাঠাও নাই কেন?' মন্ত্রীর, পাত্রের, গর্দান গেল।

সকলে চমকিল, এ আবার কী! ভয়ে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। কাঁকনমালা রানি হইয়া বসিল, কাঞ্চনমালা দাসি হইয়া রহিলেন! রাজা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

৬

কাঞ্চনমালা আঁস্তাকুড়ে বসিয়া মাছ কোটেন আর কাঁদেন—

'হাতের কাঁকন দিয়া কিনিলাম দাসি,
সেই হইল রানি, আমি হইলাম বাঁদি।
কী বা পাপে সোনার রাজার রাজ্য গেল ছার
কী বা পাপে ভাঙিল কপাল কাঞ্চনমালার?'

রানি কাঁদেন আর চোখের জলে ভাসেন।

রাজার কষ্টের সীমা নাই। গায়ে মাছি ভিনভিন, সূঁচের জ্বালায় গা-মুখ চিনচিন, কে বাতাস করে, কে বা ওষুধ দেয়!

তবে খাই তরমুজ

৭

একদিন ক্ষার-কাপড় ধুইতে কাঞ্চনমালা নদীর ঘাটে গিয়াছেন। দেখেন, একজন মানুষ একরাশ সূতা লইয়া গাছতলায় বসিয়া বসিয়া বলিতেছে :

'পাই এক হাজার সূঁচ,
তবে খাই তরমুজ!
সূঁচ পেতাম পাঁচ হাজার,
তবে যেতাম হাট-বাজার!
যদি পাই লাখ—
তবে দেই রাজ্যপাট!!'

রানি, শুনিয়া, আস্তে আস্তে গিয়া বলিলেন, 'কে বাছা সূঁচ চাও, আমি দিতে পারি। তা সূঁচ কি তুমি তুলিতে পারিবে?'

শুনিয়া মানুষটা চুপচাপ সূতার পুঁটলি তুলিয়া রানির সঙ্গে চলিল।

৮

পথে যাইতে যাইতে কাঞ্চনমালা মানুষটির কাছে আপনার দুঃখের কথা সব বলিলেন। শুনিয়া মানুষ বলিল, 'আচ্ছা!'

রাজপুরিতে গিয়া মানুষ রানিকে বলিল, 'রানিমা, রানিমা, আজ পিট-কুড়ুলির ব্রত, রাজ্যে পিঠা বিলাইতে হয়। আমি লালসূতা নীলসূতা রাঙাইয়া দি, আপনি গিয়ে আঙিনায় আলপনা দিয়া পিঁড়ি সাজাইয়া দেন; ও দাসিমানুষ জোগাড়-জাগাড় দিক।'

রানি আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন, 'তা কেন, হইল-হইল দাসি, দাসিও আজ পিঠা করুক।' তখন রানি আর দাসি দুইজনেই পিঠা করিতে গেলেন।

ও মা! রানি যে পিঠা করিলেন—আস্কে পিঠা, চাস্কে পিঠা আর ঘাস্কে পিঠা! দাসি চন্দ্রপুলী, মোহনবাঁশি, ক্ষীরমুরলী, চন্দনপাতা এইসব পিঠা করিয়াছেন।

মানুষ বুঝিল যে, কে রানি আর কে দাসি।

পিঠে-শিঠে করিয়া, দুইজনে আলপনা দিতে গেলেন। রানি একমণ চাল বাটিয়া সাত কলস জলে গুলিয়া এ-ই একগোছা শনের নুড়ি ডুবাইয়া সারা আঙিনা লেপিতে বসিলেন।

এখানে এক খাবল দেন, ওখানে এক খাবল দেন।

দাসি আঙিনার এককোণে একটু ঝাড়ঝুড় দিয়া পরিষ্কার করিয়া একটুকু চালের গুঁড়ায় খানিকটা জল মিশাইয়া, এতটুকু নেকড়া ভিজাইয়া, আস্তে আস্তে, পদ্মলতা আঁকিলেন, পদ্মলতার পাশে সোনার সাত কলস আঁকিলেন ; কলসের উপর চূড়া, দুই দিকে ধানের ছড়া আঁকিয়া ময়ূর, পুতুল, মা-লক্ষ্মীর সোনা-পায়ের দাগ এইসব আঁকিয়া দিলেন।

তখন মানুষ কাঁকনমালাকে ডাকিয়া বলিল, 'ও বাঁদি ! এই মুখে রানি হইয়াছিস ?

হাতের কাঁকনের নাগন্ দাসি !
সেই হইল রানি, রানি হইলেন দাসি !

ভালো চাহিস তো, স্বরূপ কথা-ক।'

কাঁকনমালার গায়ে আগুনে হলকা পড়িল। কাঁকনমালা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, 'কে রে পোড়ারমুখো দূর হবি তো হ।' জল্লাদকে ডাকিয়া বলিল, 'দাসির আর ঐ নির্বংশের গর্দান নেও, ওদের রক্ত দিয়া আমি স্নান করিব, তবে আমার নাম কাঁকনমালা।'

রাজা আর মন্ত্রী বন্ধু

জল্লাদ গিয়া দাসি আর মানুষকে ধরিল। তখন মানুষটা পুঁটলি খুলিয়া বলিল :

'সূতন সূতন নটখটি !
রাজার রাজ্যে ঘটমটি

সূতন সূতন নেবোর পো,
জল্লাদকে, বেঁধে থো।'

একগোছা সূতা গিয়া জল্লাদকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া থুইল।

মানুষটা আবার বলিল, **'সূতন তুমি কার?'**
সূতা বলিল **'পুঁটলি যার তার।'**

মানুষ বলিল :

'যদি সূতন আমার খাও।

কাঁকনমালার নাকে যাও।'

সূতোর দুই গুটি গিয়া কাঁকনমালার নাকে ঢিবি হইয়া বসিল। কাঁকনমালা ব্যস্তে-মস্তে ঘরে উঠিয়া বলিতে লাগিল, 'দুঁয়ার দাঁও, দুঁয়ার দাঁও, এঁটা পাঁগন, দাঁসি পাঁগন নিয়া আঁসিয়াছে।'

পাগল তখন মন্ত্র পড়িতেছে :

'সূতন সূতন সরুলি, কোন্ দেশে ঘর?
সূঁচরাজার সূঁচে গিয়ে আপনি পর।'

দেখিতে-না-দেখিতে হিলহিল করিয়া লাখ সূতা রাজার গায়ের লাখ সূঁচে পরিয়া গেল।

তখন সূঁচেরা বলিল, **'সূতার পরান সীলি সীলি, কোন্ ফুঁড়ন দি।'**

মানুষ বলিল, **'নাগন দাসি কাঁকনমালার চোখ-মুখটি।'**

রাজার গায়ের লাখ সূঁচ উঠিয়া গেল, লাখ সূঁচে কাঁকনমালার চোখ-মুখ সিলাই করিয়া রহিল। কাঁকনমালার যে ছটফটি !

রাজা চক্ষু চাহিয়া দেখেন—রাখাল বন্ধু !

রাজায় রাখালে কোলাকুলি করিলেন। রাজার চোখের জলে রাখাল ভাসিল, রাখালের চোখের জলে রাজা ভাসিলেন।

রাজা বলিলেন, 'বন্ধু আমার দোষ নিও না, শতজন্ম তপস্যা করিয়াও তোমার মতো বন্ধু পাইব না। আজ হইতে তুমি আমার মন্ত্রী। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কত কষ্ট পাইলাম, আর ছাড়িব না।'

রাখাল বলিল, 'আচ্ছা ! তা তোমার সেই বাঁশিটি যে হারাইয়া ফেলিয়াছি, একটি বাঁশি দিতে হইবে !'

রাজা রাখাল-বন্ধুকে সোনার বাঁশি তৈয়ার করাইয়া দিলেন।

তাহার পর সূঁচের জ্বালায় দিনরাত ছটফট করিয়া কাঁকনমালা মরিয়া গেল। কাঞ্চনমালার দুঃখ ঘুচিল।

তখন—রাখাল সারাদিন মন্ত্রীর কাজ করেন। রাত্রে চাঁদের আলোতে আকাশ ভরিয়া গেলে, রাজাকে লইয়া গিয়া নদীর ধারে সেই গাছের তলায় বসিয়া সোনার বাঁশি বাজান। রাজা গলাগলি করিয়া মন্ত্রী-বন্ধুর বাঁশি শোনেন।

রাজা, রাখাল আর কাঞ্চনমালার সুখে দিন যাইতে লাগিল।

সাত ভাই চম্পা

রাজার মালী

১

এক রাজার সাত রানি। দেমাকে বড়রানিদের মাটিতে পা পড়ে না। ছোটরানি খুব শান্ত। এজন্য রাজা ছোটরানিকে সকলের চাইতে বেশি ভালোবাসিতেন। কিন্তু, অনেক দিন পর্যন্ত রাজার ছেলেমেয়ে হয় না। এতবড় রাজ্য, কে ভোগ করিবে? রাজা মনের দুঃখে থাকেন।

এইরূপে দিন যায়। কতদিন পরে—ছোটরানির ছেলে হইবে। রাজার মনে আনন্দ ধরে না ; পাইক-পিয়াদা ডাকিয়া, রাজা রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন—রাজা রাজভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন; মিঠাইমণ্ডা, মণি-মানিক যে যত পার, আসিয়া নিয়া যাও।

বড়রানিরা হিংসায় জ্বলিয়া মরিতে লাগিল।

রাজা আপনার কোমরে, ছোটরানির কোমরে এক সোনার শিকল বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন—'যখন ছেলে হইবে, এই শিকলে নাড়া দিও, আমি আসিয়া ছেলে দেখিব!' বলিয়া, রাজা রাজদরবারে গেলেন।

ছোটরানির ছেলে হইবে, আঁতুড়ঘরে কে যাইবে? বড়রানিরা বলিলেন, 'আহা, ছোটরানির ছেলে হইবে, তা অন্য লোক দিব কেন? আমরাই যাইব।'

বড়রানিরা আঁতুড়ঘরে গিয়াই শিকলে নাড়া দিলেন। অমনি রাজসভা ভাঙিয়া, ঢাকঢোলের বাদ্য দিয়া, মণি-মানিক হাতে ঠাকুর-পুরুত সাথে, রাজা আসিয়া দেখেন—কিছুই না!

রাজা ফিরিয়া গেলেন।

রাজা সভায় বসিতে-না-বসিতেই আবার শিকলে নাড়া পড়িল।

রাজা আবার ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন, এবারও কিছুই না। মনের কষ্টে রাজা রাগ করিয়া বলিলেন, 'ছেলে না হইতে আবার শিকল নাড়া দিলে, আমি সব রানিকে কাটিয়া ফেলিব।' বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন।

একে একে ছোটরানির সাতটি ছেলে একটি মেয়ে হইল। আহা, ছেলেমেয়েগুলি যে— চাঁদের পুতুল—ফুলের কলি। আঁকুপাঁকু করিয়া হাত নাড়ে, পা নাড়ে— আঁতুড়ঘর আলো হইয়া গেল।

ছোটরানি আস্তে আস্তে বলিলেন, 'দিদি, কী ছেলে হইল একবার দেখাইলি না!'

বড়রানিরা ছোটরানির মুখের কাছে অঙ্গভঙ্গি করিয়া হাত নাড়িয়া, নথ নাড়িয়া, বলিয়া উঠিল—'ছেলে না, হাতি হইয়াছে, ওঁর আবার ছেলে হইবে! কটা ইঁদুর আর কটা কাঁকড়া হইয়াছে।'

শুনিয়া ছোটরানি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

নিষ্ঠুর বড়রানিরা আর শিকলে নাড়া দিল না। চুপিচুপি হাঁড়ি-সরা আনিয়া, ছেলেমেয়েগুলিকে তাহাতে পুরিয়া, পাঁশ-গাদায় পুঁতিয়া ফেলিয়া আসিল। আসিয়া, তাহার পর শিকল ধরিয়া টান দিল।

রাজা আবার ঢাকঢোলের বাদ্য দিয়া, মণি-মানিক হাতে ঠাকুর-পুরুত সাথে আসিলেন। বড়রানিরা হাত মুছিয়া, মুখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কতকগুলি ব্যাঙের ছানা, ইঁদুরের ছানা আনিয়া দেখাইল।

দেখিয়া রাজা আগুন হইয়া, ছোটরানিকে রাজপুরির বাহির করিয়া দিলেন। বড়রানিদের মুখে আর হাসি ধরে না; পায়ের মলের বাজনা থামে না। সুখের কাঁটা দূর হইল ; রাজপুরিতে আগুন দিয়া ঝগড়া-কোন্দল সৃষ্টি করিয়া ছয় রানিতে মনের সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

পোড়াকপালি ছোটরানির দুঃখে গাছ-পাথর ফাটে, নদী-নালা শুকায়—ছোটরানি ঘুঁটেকুড়ানি দাসি হইয়া, পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

২

এমনি করিয়া দিন যায়। রাজার মনে সুখ নাই, রাজার রাজ্যে সুখ নাই, রাজপুরী খাঁ-খাঁ করে, রাজার বাগানে ফুল ফোটে না, রাজার পূজা হয় না।

একদিন, মালী আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, নিত্যপূজার ফুল পাই না; আজ যে, পাঁশগাদার উপরে, সাত চাঁপা এক পারুল গাছে—টুলটুলে সাত চাঁপা আর এক পারুল ফুটিয়া রহিয়াছে।'

রাজা বলিলেন :

'তবে সেই ফুল আনো, পূজা করিব।'

মালী ফুল আনিতে গেল।

মালীকে দেখিয়া পারুলগাছে পারুলফুল চাঁপাফুলদিগকে ডাকিয়া বলিল, **'সাত ভাই চম্পা জাগো রে!'**

অমনি সাত চাঁপা নড়িয়া উঠিয়া সাড়া দিল—

'কেন বোন পারুল ডাকো রে।'

পারুল বলিল :

'রাজার মালী এসেছে,

পূজার ফুল দিবে কি না দিবে?'

সাত চাঁপা তুরতুর করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল :

'না দিব, না দিব ফুল উঠিব শতেক দূর,

আগে আসুক রাজা, তবে দিব ফুল!'

দেখিয়া শুনিয়া মালী অবাক হইয়া গেল। ফুলের সাজি ফেলিয়া, দৌড়িয়া গিয়া রাজার কাছে খবর দিল।

আশ্চর্য হইয়া রাজা, রাজসভার সকলে সেইখানে আসিলেন।

৩

রাজা আসিয়া ফুল তুলিতে গেলেন, অমনি পারুলফুল চাঁপাফুলদিগকে ডাকিয়া বলিল :

'সাত ভাই চম্পা জাগো রে!'

চাঁপারা উত্তর দিল, **'কেন বোন পারুল ডাকো রে?'**

পারুল বলিল, 'রাজা আপনি এসেছেন,
ফুল দেবে কি না দিবে?'
চাঁপারা বলিল, 'না দিব না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজার বড়রানি,
তবে দিব ফুল।'

বলিয়া, চাঁপাফুলেরা আরও উঁচুতে উঠিল।

রাজা বড়রানিকে ডাকাইলেন। বড়রানি মল বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া ফুল তুলিতে গেল। চাঁপাফুলেরা বলিল :

'না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজার মেজরানি, তবে দিব ফুল।'

তাহার পর মেজরানি আসিলেন, সেজরানি আসিলেন, ন-রানি আসিলেন, কনে-রানি আসিলেন, কেহই ফুল পাইলেন না। ফুলেরা গিয়া আকাশে তারার মতো ফুটিয়া রহিল।

রাজা গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

শেষে দুয়োরানি আসিলেন; তখন ফুলেরা বলিল :

'না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
যদি আসে রাজার ঘুঁটেকুড়ানি দাসি,
তবে দিব ফুল।'

তখন খোঁজ-খোঁজ পড়িয়া গেল। রাজা চৌদোলা পাঠাইয়া দিলেন, পাইক-বেহারারা চৌদোলা লইয়া মাঠে গিয়া ঘুঁটেকুড়ানি দাসি ছোটরানিকে লইয়া আসিল।

ছোটরানির হাতে পায়ে গোবর, পরনে ছেঁড়া কাপড়, তাই লইয়া তিনি ফুল তুলিতে গেলেন। অমনি সুরসুর করিয়া চাঁপারা আকাশ হইতে নামিয়া আসিল, পারুল ফুলটি গিয়া তাদের সঙ্গে মিশিল; ফুলের মধ্য হইতে সুন্দর সুন্দর চাঁদের মতো সাত রাজপুত্র, এক রাজকন্যা 'মা মা' বলিয়া ডাকিয়া, ঝুপঝুপ করিয়া ঘুঁটেকুড়ানি দাসি ছোটরানির কোলে-কাঁখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সকলে অবাক! রাজার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল গড়াইয়া গেল। বড়রানিরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

রাজা তখনি বড়রানিদিগে হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়া, সাত-রাজপুত্র, পারুল-মেয়ে আর ছোটরানিকে লইয়া রাজপুরিতে গেলেন।

রাজপুরিতে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

শীত-বসন্ত

১

এক রাজার দুই রানি—সুয়োরানি আর দুয়োরানি। সুয়োরানি যে, নুন্‌টুকু উন হইতেই নখের আগায় আঁচড় কাটিয়া, ঘরকন্নায় ভাগ বাঁটিয়া সতিনকে একপাশ করিয়া দেয়। দুঃখে দুয়োরানির দিন কাটে।

সুয়োরানির ছেলেপিলে হয় না। দুয়োরানির দুই ছেলে—শীত আর বসন্ত। আহা, ছেলে নিয়া দুয়োরানির যে যন্ত্রণা! রাজার রাজপুত্র, সৎ-মায়ের গঞ্জনা খাইতে খাইতে দিন যায়।

একদিন নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া সুয়োরানি দুয়োরানিকে ডাকিয়া বলিল, 'আয় তো, তোর মাথায় ক্ষার-খৈল দিয়া দি।' ক্ষার-খৈল দিতে দিতে সুয়োরানি চুপ করিয়া দুয়োরানির মাথায় এক ওষুধের বড়ি টিপিয়া দিল। দুঃখিনী দুয়োরানি টিয়া হইয়া 'টি টি' করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

বাড়ি আসিয়া সুয়োরানি বলিল, 'দুয়োরানি তো জলে ডুবিয়া মরিয়াছে!'

রাজা তাহাই বিশ্বাস করিলেন।

রাজপুরির লক্ষ্মী গেল, রাজপুরি আঁধার হইল; মা-হারা শীত-বসন্তের দুঃখের সীমা রহিল না।

টিয়া হইয়া দুঃখিনী দুয়োরানি উড়িতে উড়িতে আর এক রাজার রাজ্যে গিয়া পড়িলেন। রাজা দেখেন, সোনার টিয়া। রাজার এক টুকটুকে মেয়ে, সেই মেয়ে বলিল, 'বাবা, আমি সোনার টিয়া নিব।'

টিয়া-দুয়োরানি রাজকন্যার কাছে সোনার পিঞ্জরে রহিলেন।

২

দিন যায়, বছর যায়, সুয়োরানির তিন ছেলে হইল। ও মা! এক-এক ছেলে যে, বাঁশের পাতা—পাটকাঠি, ফুঁ দিলে উড়ে, ছুঁইতে গেলে মরে। সুয়োরানি কাঁদিয়া কাটিয়া রাজ্য ভাসাইল।

পাটকাঠি তিন ছেলে নিয়ে সুয়োরানি গুমরে গুমরে পুড়িয়া ঘর করে। মন-ভরা জ্বালা, পেট-ভরা হিংসা —আপনার ছেলেদের থালে পাঁচ পরমান্ন অষ্টরন্ধন, ঘিয়ে চপচপ পঞ্চব্যঞ্জন সাজাইয়া দেন; শীত-বসন্তের পাতে আলুন আতেল কড়কড়া ভাত সড়সড়া চাল শাকের উপর ছাইয়ের তাল ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যান।

সতিন তো 'উরী পুরী দক্ষিণ-দুরী'—সতিনের ছেলে দুইটা যে নাদুস-নুদুস, আর তাঁহার তিন ছেলে পাটকাঠি! হিংসায় রানির মুখে অন্ন রোচে না, নিশিতে নিদ্রা হয় না।

রানি তে-পথের ধূলা এলাইয়া, তিন কোণের কূটা জ্বালাইয়া, বাসি উনুনের ছাই দিয়া, ভাঙা-কুলায় করিয়া সতিনের ছেলের নামে ভাসাইয়া দিল।

কিছুতেই কিছু হইল না।

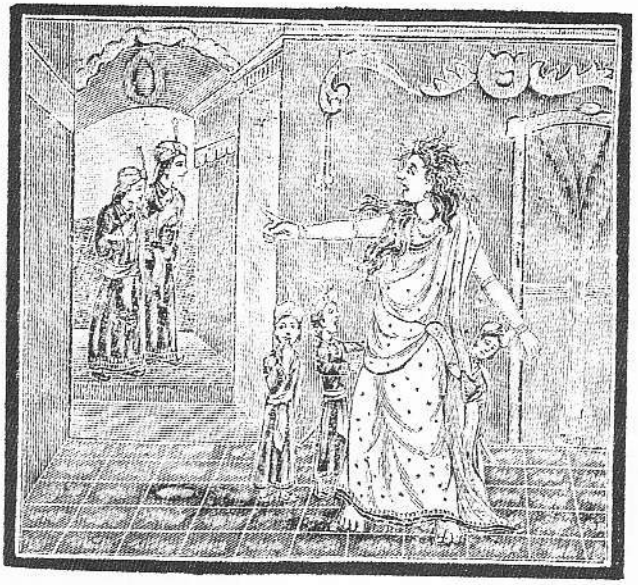

রণমূর্তি সৎ-মা গালিমন্দ দিয়া খেদাইয়া দিল।

শেষে, একদিন শীত-বসন্ত পাঠশালায় গিয়াছে; কিছুই জানে না, শোনে না, বাড়িতে আসিতেই রণমূর্তি সৎ-মা তাহাদিগে গালিমন্দ দিয়া খেদাইয়া দিল!

তাহার পর রানি, বাঁশপাতা ছেলে তিনটাকে আছাড় মারিয়া থুইয়া, উথাল-পাতাল করিয়া এ জিনিশ ভাঙে ও জিনিশ চুরে; আপন মাথার চুল ছিঁড়ে, গায়ের আভরণ ছুড়িয়া মারে।

দাসি-বাঁদি গিয়া রাজাকে খবর দিল!

'সুয়োরানির ডরে
থর থর থর করে।'

রাজা আসিয়া বলিলেন, 'এ কী!'

রানি বলিল, 'কী! সতিনের ছেলে, সেই আমাকে গালমন্দ দিল। শীত-বসন্তের রক্ত নহিলে আমি নাইব না!'

অমনি রাজা জল্লাদকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, 'শীত-বসন্তকে কাটিয়া রানিকে রক্ত আনিয়া দাও।'

শীত-বসন্তের চোখের জল কে দেখে! জল্লাদ শীত-বসন্তকে বাঁধিয়া নিয়া গেল।

৩

এক বনের মধ্যে আনিয়া, জল্লাদ, শীত-বসন্তের রাজপোশাক খুলিয়া, বাকল পরাইয়া দিল।

শীত বলিলেন, 'ভাই, কপালে এই ছিল!'

বসন্ত বলিলেন, 'দাদা, আমরা কোথায় যাব?'

কাঁদিতে কাঁদিতে শীত বলিলেন, 'ভাই, চল, এতদিন পরে আমরা মা'র কাছে যাব।'

খড়্গ নামাইয়া রাখিয়া দুই রাজপুত্রের বাঁধন খুলিয়া দিয়া, ছলছল চোখে জল্লাদ বলিল—'রাজপুত্র! রাজার আজ্ঞা, কী করিব—কোলে-কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়াছি, সেই সোনার অঙ্গে আজ কি-না খড়্গ

ছোঁয়াইতে হইবে। আমি তা পারিব না রাজপুত্র। আমার কপালে যা থাকে থাকুক, এই বাকল-চাদর পরিয়া বনের পথে চলিয়া যাও, কেহ আর রাজপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিবে না।'

বলিয়া, শীত-বসন্তকে পথ দেখাইয়া দিয়া, দুইটা শিয়াল-কুকুর কাটিয়া জল্লাদ রক্ত নিয়া রানিকে দিল।

রানি সেই রক্ত দিয়া স্নান করিলেন ; খিলখিল করিয়া হাসিয়া আপনার তিন ছেলে কোলে, পাঁচ পাত সাজাইয়া খাইতে বসিলেন।

৪

শীত-বসন্ত দুই ভাই চলেন, চলেন; বন আর ফুরায় না। শেষে, দুই ভাইয়ে এক গাছের তলায় বসিলেন।

বসন্ত বলিলেন, 'দাদা, বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, জল কোথায় পাই?'

শীত বলিলেন, 'ভাই, এত পথ আসিলাম, জল তো কোথাও দেখিলাম না। আচ্ছা, তুমি বস, আমি জল দেখিয়া আসি।'

বসন্ত বসিয়া রহিল, শীত জল আনিতে গেলেন।

যাইতে, যাইতে, অনেক দূরে গিয়া, শীত বনের মধ্যে এক সরোবর দেখিতে পাইলেন। জলের তৃষ্ণায় বসন্ত না-জানি কেমন করিতেছে—কিন্তু কিসে করিয়া জল নিবেন? তখন গায়ের যে চাদর, সেই চাদর খুলিয়া, শীত সরোবরে নামিলেন।

সেই দেশের যে রাজা, মারা গিয়েছেন। রাজার ছেলে নাই, পুত্র নাই, রাজসিংহাসন খালি পড়িয়া আছে। রাজ্যের লোকজনে শ্বেত রাজহাতির পিঠে পাটসিংহাসন উঠাইয়া দিয়া হাতি ছাড়িয়া দিল। হাতি যাহার কপালে রাজটিকা দেখিবে, তাহাকেই রাজসিংহাসনে উঠাইয়া দিয়া আসিবে, সে-ই রাজ্যের রাজা হইবে।

রাজসিংহাসন পিঠে শ্বেত রাজহাতি পৃথিবী ঘুরিয়া কাহারো কপালে রাজটিকা দেখিল না। শেষে ছুটিতে ছুটিতে, যে-বনে শীত-বসন্ত, সেই বনে আসিয়া দেখে, এক রাজপুত্র গায়ের চাদর ভিজাইয়া সরোবরে জল নিতেছে। রাজপুত্রের কপালে রাজটিকা। দেখিয়া, শ্বেত রাজহাতি অমনি শুঁড় বাড়াইয়া শীতকে ধরিয়া সিংহাসনে তুলিয়া নিল।

'ভাই বসন্ত, ভাই বসন্ত' করিয়া শীত কত কাঁদিলেন। হাতি কি তাহা মানে?

বন-জঙ্গল ভাঙিয়া, পাট-হাতি শীতকে পিঠে করিয়া ছুটিয়া গেল।

৫

জল আনিতে গেল, দাদা আর ফিরে না। বসন্ত উঠিয়া সকল বন খুঁজিয়া, 'দাদা, দাদা' বলিয়া ডাকিয়া খুন হইল। দাদাকে যে হাতিতে নিয়াছে, বসন্ত তো তাহা জানে না ; বসন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। শেষে, দিন গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা গেল, রাত্রি হইল ; তৃষ্ণায়-ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, দাদাকে হারাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বসন্ত এক গাছের তলায় ধূলামাটিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুঃখিনী মায়ের বুকের মানিক ছাইপাঁশে গড়াগড়ি গেল।

খুব ভোরে, এক মুনি, জপতপ করিবেন—জল আনিতে সরোবরে যাইতে দেখেন—কোন্ এক পরম সুন্দর রাজপুত্র গাছের তলায় ধূলামাটিতে পড়িয়া আছে। দেখিয়া, মুনি বসন্তকে বুকে তুলিয়া নিয়া গেলেন।

৬

শ্বেত রাজহাতির পিঠে শীত তো সেই নাই-রাজার রাজ্যে গেলেন! যাইতেই, রাজ্যের যত লোক আসিয়া মাটিতে মাথা ছোঁয়াইল; মন্ত্রী, অমাত্য, সিপাই-সান্ত্রীরা সকলে আসিয়া মাথা নোয়াইল, নোয়াইয়া সকলে রাজসিংহাসনে তুলিয়া নিয়া শীতকে রাজা করিল।

প্রাণের ভাই বসন্ত, সেই বসন্ত বা কোথায়, শীত বা কোথায়! দুঃখিনী মায়ের দুই মানিক বোঁটা ছিঁড়িয়া দুইখানে পড়িল।

রাজা হইয়া শীত ধনরত্ন, মণিমানিক্য, হাতি-ঘোড়া, সিপাই-লস্কর লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আজ এ-রাজাকে হারাইয়া দিয়া তাহার রাজ্য নেন, কাল ও-রাজাকে হারাইয়া দিয়া তাহার রাজ্য আনেন; আজ মৃগয়া করেন, কাল দিগ্বিজয়ে যান— এইরকমে দিন যায়!

মুনির কাছে আসিয়া বসন্ত—গাছের ফল খায়, সরোবরের জলে নায়, দায়, থাকে। মুনি চারিপাশে আগুন করিয়া বসিয়া থাকেন, কতদিন কাঠকুটা ফুরাইয়া যায়—বসন্তের পরনে বাকল, হাতে নড়ি, বনে বনে ঘুরিয়া কাঠকুটা কুড়াইয়া মুনির জন্য বহিয়া আনে।

তাহার পর বসন্ত বনের ফুল তুলিয়া মুনির কুটির সাজায় আর সারাদিন ভরিয়া ফুলের মধু খায়।

তাহার পর, সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে, বনের পাখি সব একখানে হয়, আপন আপন বাসায় যায়, বসন্ত মুনির পাশে বসিয়া কত শাস্ত্রের কথা, কত মন্ত্রের কথা এইসব শোনে। এইভাবে দিন যায়।

রাজসিংহাসনে শীত আপন রাজ্য লইয়া, বনে বসন্ত আপন বন লইয়া—দিনে দিনে পলে পলে কাহারো কথা কাহারো মনে থাকিল না।

৭

তিন রাত যাইতে-না-যাইতে সুয়োরানির পাপে রাজার সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল—দিন যাইতে-না-যাইতেই রাজার রাজ্য গেল, রাজপাট গেল। সকল হারাইয়া, খোয়াইয়া রাজা আর সুয়োরানির মুখ দেখিলেন না; রাজা বনবাসে গেলেন।

সুয়োরানির যে, সাজা! ছেলে তিনটা সঙ্গে, এক নেকড়া পরনে, এক নেকড়া গায়ে; এ দুয়ারে যায়—'দূর, দূর!' ও দুয়ারে যায়—'ছেই, ছেই!!' তিন ছেলে নিয়া সুয়োরানি চক্ষের জলে ভাসিয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে সুয়োরানি সমুদ্রের কিনারে গেলেন। আর সাত সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া চক্ষের পলকে সুয়োরানির তিন ছেলেকে ভাসাইয়া নিয়া গেল। সুয়োরানি কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইল; বুকে চাপড়, কপালে চাপড় দিয়া, শোকে দুঃখে পাগল হইয়া মাথায় পাষাণ মারিয়া, সুয়োরানি সকল জ্বালা এড়াইল। সুয়োরানির জন্য পিঁপড়াটিও কাঁদিল না, কুটাটুকুও নড়িল না; সাত সমুদ্রের জল সাতদিনের পথে সরিয়া গেল। কোথায় বা সুয়োরানি, কোথায় বা তিন ছেলে—কোথাও কিছু রহিল না।

৮

সেই যে সোনার টিয়া—সেই যে রাজার মেয়ে! সেই রাজকন্যার যে স্বয়ম্বর। কত ধন, কত দৌলত, কত কী লইয়া কত দেশের কত রাজপুত্র আসিয়াছেন। সভা করিয়া সকলে বসিয়া আছেন। এখনো রাজকন্যার বা'র নাই।

রূপবতী রাজকন্যা আপন ঘরে সিঁথিপাটি কাটিয়া, আলতা-কাজল পরিয়া, সোনার টিয়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

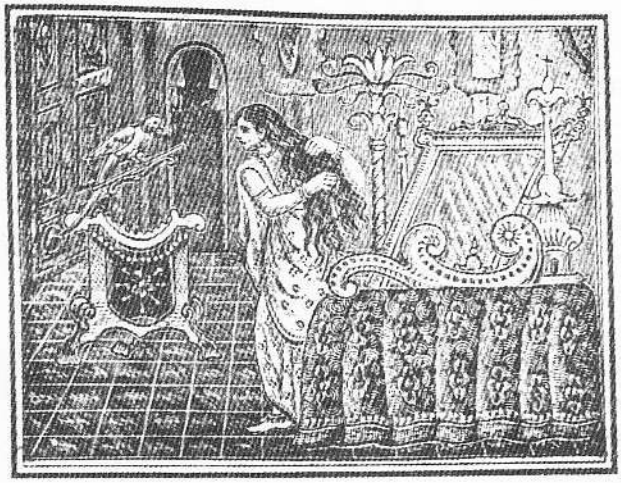

সোনার টিয়া, বল্ তো আমার আর কী চাই?

'সোনার টিয়া, বল্ তো আমার আর কী চাই?'

টিয়া বলিল :

'সাজত ভালো কন্যা, যদি সোনার নূপুর পাই!'

রাজকন্যা কৌটা খুলিয়া সোনার নূপুর বাহির করিয়া পায়ে দিলেন। সোনার নূপুর রাজকন্যার পায়ে রুনুঝুনু করিয়া বাজিয়া উঠিল! রাজকন্যা বলিলেন :

'সোনার টিয়া বল্ তো আমার আর কী চাই?

টিয়া বলিল :

'সাজত ভালো কন্যা, যদি ময়ূরপেখম পাই!'

রাজকন্যা পেটরা আনিয়া ময়ূরপেখম শাড়ি খুলিয়া পরিলেন। শাড়ির রঙে ঘর উজল, শাড়ির শোভায় রাজকন্যার মন উতল। মুখখানা ভার কটিয়া টিয়া বলিল :

'রাজকন্যা, রাজকন্যা, কিসের গরব কর ;
শতেক নহর হীরার হার গলায় না পর!'

রাজকন্যা শতেক নহর হীরার হার গলায় দিলেন। শতেক নহরে শতেক হীরা ঝকঝক করিয়া উঠিল। টিয়া বলিল :

'শতেক নহর ছাই!
নাকে ফুল কানে দুল
সিঁথির মানিক চাই!'

রাজকন্যা নাকে মোতির ফুলের নোলক পরিলেন ; সিঁথিতে মণিমাণিক্যের সিঁথি পরিলেন। তখন রাজকন্যার টিয়া বলিল :

'রাজকন্যা রূপবতী নাম থুয়েছে মায়।
গজমোতি হত শোভা ষোলো-কলায়।
না আনিল গজমোতি, কেমন এল বর?
রাজকন্যা রূপবতীর ছাইয়ের স্বয়ম্বর!'

শুনিয়া, রূপবতী রাজকন্যা গায়ের আভরণ, পায়ের নূপুর, ময়ূরপেখম, কানের দুল ছুড়িয়া, ছিঁড়িয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। কিসের স্বয়ম্বর, কিসের কী!

রাজপুত্রদের সভায় খবর গেল, রাজকন্যা রূপবতী স্বয়ম্বর করিবেন না; রাজকন্যার পণ, যে-রাজপুত্র গজমোতি আনিয়া দিতে পারিবেন, রাজকন্যা তাঁহার হইবেন—না পারিলে রাজকন্যার নফর হইয়া থাকিতে হইবে।

সকল রাজপুত্র গজমোতির সন্ধানে বাহির হইলেন।

কত রাজ্যের কত হাতি আসিল, কত হাতির মাথা কাটা গেল! যে-সে হাতিতে কি গজমোতি থাকে? গজমোতি পাওয়া গেল না।

রাজপুত্রেরা শুনিলেন :

'সমুদ্রের কিনারে হাতি,
তাহার মাথায় গজমোতি।'

সকল রাজপুত্রে মিলিয়া সমুদ্রের ধারে গেলেন।

সমুদ্রের ধারে যাইতে-না-যাইতেই একপাল হাতি আসিয়া অনেক রাজপুত্রকে মারিয়া ফেলিল, অনেক রাজপুত্রের হাত গেল, পা গেল। গজমোতি কি মানুষে আনিতে পারে? রাজপুত্রেরা পালাইয়া আসিলেন।

আসিয়া, রাজপুত্রেরা কী করেন—রূপবতী রাজকন্যার নফর হইয়া রহিলেন।

কথা শীতরাজার কানে গেল! শীত বলিলেন, 'কী! রাজকন্যার এত তেজ, রাজপুত্রদিগকে নফর করিয়া রাখে। রাজকন্যার রাজ্য আটক কর।'

রাজকন্যা শীতরাজার হাতে আটক হইয়া রহিলেন।

৯

আজ যায়, কাল যায়, বসন্ত মুনির বনে থাকেন। পৃথিবীর খবর বসন্তের কাছে যায় না, বসন্তের খবর পৃথিবী পায় না।

মুনির পাতার কুঁড়ে; পাতার কুঁড়েতে এক শুক আর এক শারি থাকে।

'শারি, শারি! বড় শীত!'

শারি বলে :

'গায়ের বসন টেনে দিস!'

শুক বলে :

'বসন গেল ছিঁড়ে, শীত গেল দূর,
কোন্ খানে, শারি, নদীর কূল?'

শারি উত্তর করিল :

'দুধ-মুকুটে' ধবল পাহাড় ক্ষীর-সাগরের পাড়ে,
গজমোতির রাঙা আলো ঝরঝরিয়ে পড়ে।
আলোর তলে পদ্ম-পাতে খেলে দুধের জল,
হাজার হাজার ফুটে আছে সোনার-কমল!'

শুক কহিল :

'সেই সোনার কমল, সেই গজমোতি
কে আনবে তুলে, কে পাবে রূপবতী!'

শুনিয়া বসন্ত বলিলেন :

'শুক-শারি মেসো-মাসি
কী বলছিস বল,
আমি আনব গজমোতি
সোনার কমল!'

শুক শারি বলিল, 'আহা বাছা, পারিবি?'

বসন্ত বলিলেন, 'পারিব না তো কী!'

শুক বলিল, 'তবে মুনির কাছে গিয়া ত্রিশূলটা চা'!'

শারি বলিল, 'শিমূল গাছে কাপড়চোপড় আছে,
মুকুট আছে, তাই নিয়া যা।'

বসন্ত মুনির কাছে গেল। গিয়া বলিল, 'বাবা আমি গজমোতি আর সোনার কমল আনিব, ত্রিশূলটা দাও।'

মুনি ত্রিশূল দিলেন।

মুনির পায়ে প্রণাম করিয়া, ত্রিশূল হাতে বসন্ত শিমুলগাছের কাছে গেলেন। গিয়া দেখেন, শিমূল গাছে কাপড়চোপড়, শিমুল গাছে রাজমুকুট। বসন্ত বলিলেন, 'হে বৃক্ষ, যদি সত্যকারের বৃক্ষ হও, তো, তোমার কাপড়চোপড় আর তোমার রাজমুকুট আমাকে দাও।'

বৃক্ষ বসন্তকে কাপড়চোপড় আর রাজমুকুট দিল। বসন্ত বাকল ছাড়িয়া কাপড়চোপড় পরিলেন; রাজমুকুট মাথায় দিলেন। দিয়া, বসন্ত ক্ষীর-সাগরের উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন।

যাইতে, যাইতে, যাইতে, বসন্ত কত পর্বত, কত বন, কত দেশ-বিদেশ ছাড়াইয়া বারো বচ্ছর তেরো দিনে 'দুধ-মুকুটে', ধবল পাহাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন। ধবল পাহাড়ের মাথায় দুধের সর থকথক, ধবল পাহাড়ের গায়ে দুধের ঝরনা ঝরঝর; বসন্ত সেই পাহাড়ে উঠিলেন।

উঠিয়া দেখেন, ধবল পাহাড়ের নিচে ক্ষীরের সাগর—

'ক্ষীর-সাগরে ক্ষীরের ঢেউ ঢল্‌ঢল্ করে—
লক্ষ হাজার পদ্মফুল ফুটে আছে থরে।
ঢেউ থই থই সোনার কমল, তারি মাঝে কী?
দুধের বরণ হাতির মাথে—গজমোতি

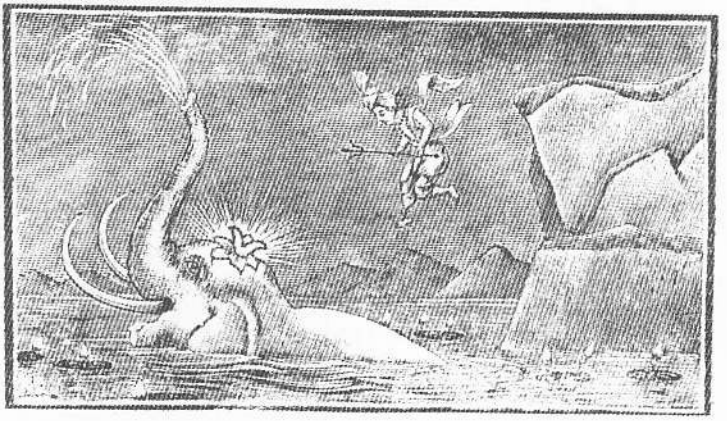

গজমোতি

বসন্ত দেখিলেন, চারিদিকে পদ্মফুলের মধ্যে দুধবরণ হাতি দুধের জল ছিটাইয়া খেলা করিতেছে—সেই হাতির মাথায় গজমোতি—সোনার মতোন, মণির মতোন, হীরার মতোন গজমোতির জ্বলজ্বলে আলো ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে। গজমোতির আলোতে ক্ষীর-সাগরে হাজার চাঁদের মেলা, পদ্মের বনে পাতে পাতে সোনার কিরণ খেলা। দেখিয়া, বসন্ত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন, বসন্ত, কাপড়চোপড় কষিয়া, হাতের ত্রিশূল আঁটিয়া ধবল পাহাড়ের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া গজমোতির উপরে পড়িলেন।

অমনি ক্ষীর-সাগর শুকাইয়া গেল, পদ্মের বন লুকাইয়া গেল; দুধ-বরণ হাতি এক সোনার পদ্ম হইয়া জিজ্ঞাসা করিল :

'কোন্ দেশের রাজপুত্র, কোন্ দেশে ঘর?'

বসন্ত বলিলেন :

'বনে বনে বাস, আমি মুনির কোঙর।'

পদ্ম বলিল :

'মাথে রাখো গজমোতি, সোনার কমল বুকে,
রাজকন্যা রূপবতী ঘর করুক সুখে!'

বসন্ত সোনার পদ্ম তুলিয়া বুকে রাখিলেন, গজমোতি তুলিয়া মাথায় রাখিলেন। রাখিয়া, ক্ষীর-সাগরের বালুর উপর দিয়া বসন্ত দেশে চলিলেন।

অমনি ক্ষীর-সাগরের বালুর তলে কাহারা বলিয়া উঠিল, 'ভাই, ভাই! আমাদিগে নিয়ে যাও।'

বসন্ত ত্রিশূল দিয়া বালু খুঁড়িয়া দেখেন, তিন যে সোনার মাছ! তিন সোনার মাছ লইয়া বসন্ত চলিতে লাগিলেন।

বসন্ত যেখান দিয়া যান, গজমোতির আলোতে দেশ উজল হইয়া উঠে। লোকেরা বলে, 'দেখ, দেখ, দেবতা যায়!'

বসন্ত চলিতে লাগিলেন।

১০

শীতরাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সকল রাজ্যের বন খুঁজিয়া একটা হরিণ যে, তাহাও পাওয়া গেল না। শীত সৈন্যসামন্তের হাতে ঘোড়া দিয়া এক গাছতলায় আসিয়া বসিলেন।

গাছতলায় বসিতেই শীতের গায়ে কাঁটা দিল। শীত দেখিলেন, এই তো সেই গাছ! এই গাছের তলায় জল্লাদের কাছ হইতে বনবাসী দুই ভাই আসিয়া বসিয়াছিলেন, ভাই বসন্ত জল চাহিয়াছিল, শীত জল আনিতে গিয়াছিলেন। সব কথা শীতের মনে হইল—রাজমুকুট ফেলিয়া দিয়া, খাপ তরোয়াল ছুড়িয়া দিয়া, শীত, 'ভাই বসন্ত! ভাই বসন্ত!' করিয়া ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সৈন্যসামন্তেরা দেখিয়া অবাক! তাহারা দোল-চৌদোল আনিয়া রাজাকে তুলিয়া রাজ্যে লইয়া গেল।

১১

গজমোতির আলোতে দেশ উজল করিতে করিতে বসন্ত রূপবতী রাজকন্যার দেশে আসিলেন।

রাজ্যের লোক ছুটিয়া আসিল, 'দেখ, দেখ, কে আসিয়াছেন!'

বসন্ত বলিলেন, 'আমি বসন্ত, গজমোতি আনিয়াছি।'

রাজ্যের লোক কাঁদিয়া বলিল, 'এক দেশের শীতরাজা রাজকন্যাকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।'

রাজা মোদের ভাই

শুনিয়া, বসন্ত শীতরাজার রাজ্যে গিয়া, তিন সোনার মাছ রাজাকে পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, 'রূপবতী রাজকন্যার রাজ্যের দুয়ার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা হউক!'

সকলে বলিলেন, 'দেবতা গজমোতি আনিয়াছেন। তা, রাজা আমাদের, ভাইয়ের শোকে পাগল; সাত দিন সাত রাত্রি না-গেলে তো দুয়ার খুলিবে না।'

ত্রিশূল হাতে, গজমোতি মাথায় বসন্ত, দুয়ার আলো করিয়া সাত দিন সাত রাত্রি বসিয়া রহিলেন।

আট দিনের দিন রাজা একটু ভালো হইয়াছেন, দাসি গিয়া সোনার মাছ কুটিতে বসিল। অমনি মাছেরা বলিল—

'আঁশে ছাই, চোখে ছাই,
কেটো না কেটো না মাসি, রাজা মোদের ভাই!'

দাসি ভয়ে বটি-মটি ফেলিয়া, রাজার কাছে গিয়া খবর দিল।

রাজা বলিলেন,

'কৈ কৈ! সোনার মাছ কৈ?'
সোনার মাছ যে এনেছে সে মানুষ কৈ?'

রাজা সোনার মাছ নিয়া পড়িতে-পড়িতে ছুটিয়া বসন্তের কাছে গেলেন।

দেখিয়া বসন্ত বলিলেন, **'দাদা!'**

শীত বলিলেন, **'ভাই!'**

হাত হইতে সোনার মাছ পড়িয়া গেল; শীত বসন্তের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুই ভায়ের চোখের জল দরদর করিয়া বহিয়া গেল।

শীত বলিলেন, 'ভাই, সুয়ো-মার জন্যে দুই ভাইয়ের এতকাল ছাড়াছাড়ি।'

তিন সোনার মাছ তিন রাজপুত্র হইয়া, শীত-বসন্তের পায়ে প্রণাম করিয়া বলিল, 'দাদা, আমরাই অভাগী সুয়োরানির তিন ছেলে; আমাদের মুখ চাহিয়া মায়ের অপরাধ ভুলিয়া যান।'

শীত-বসন্ত, তিন ভাইকে বুকে লইয়া বলিলেন, 'সে কী ভাই, তোরা এমন হইয়া ছিলি! সুয়ো-মা কেমন, বাবা কেমন?'

তিন ভাই বলিল, 'সে কথা আর কী বলিব! বাবা বনবাসে, মা মরিয়া গিয়াছেন; তিন ভাই ক্ষীর-সমুদ্রের তলে সোনার মাছ হইয়া ছিলাম।'

মায়ের অপরাধ ভুলিয়া যান

শুনিয়া শীত-বসন্তের বুক ফাটিল ; চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গলাগলি পাঁচ ভাই রাজপুরী গেলেন।

১২

রাজকন্যার সোনার টিয়া পিঞ্জরে ঘোরে, ঘোরে আর কেবলি কয়—

'দুঃখিনীর ধন
সাত সমুদ্র ছেঁচে এনেছে মানিক রতন!'

রাজকন্যা বলিলেন,

'কী হয়েছে কী হয়েছে আমার সোনার টিয়া!'

টিয়া বলিল, **'জাদু আমার এল কন্যা, গজমোতি নিয়া!'**

সত্য সত্যই ; দাসি আসিয়া খবর দিল, শীতরাজার ভাই রাজপুত্র যে, গজমোতি আনিয়াছেন!

শুনিয়া রাজকন্যা রূপবতী হাসিয়া টিয়ার ঠোঁটে চুমু খাইলেন। রাজকন্যা বলিলেন, 'দাসি লো দাসি, কপিলা গাইয়ের দুধ আন্, কাঁচা হলুদ বাটিয়া আন্ ; আমার সোনার টিয়াকে নাওয়াইয়া দিব!'

দাসিরা দুধ-হলুদ আনিয়া দিল। রাজকন্যা সোনা-রুপার পিঁড়ি, পাট কাপড়ের গামছা নিয়া টিয়াকে স্নান করাইতে বসিলেন।

হলুদ দিয়া নাওয়াইতে নাওয়াইতে রাজকন্যার আঙুলে লাগিয়া টিয়ার মাথার ওষুধ-বড়ি খসিয়া পড়িল। অমনি চারিদিকে আলো হইল, টিয়ার অঙ্গ ছাড়িয়া দুয়োরানি দুয়োরানি হইলেন।

মানুষ হইয়া দুয়োরানি রাজকন্যাকে বুকে সাপটিয়া বলিলেন, 'রূপবতী মা আমার! তোরি জন্যে আবার জীবন পাইলাম!' থতমত খাইয়া রাজকন্যা রানির কোলে মাথা গুঁজিলেন।

দুয়োরানি দুয়োরানি হইলেন

রাজকন্যা বলিলেন, 'মা, আমার বড় ভয় করে, তুমি পরী, না দেবতা; এতদিন টিয়া হইয়া আমার কাছে ছিলে?'

রানি বলিলেন, 'রাজকন্যা, শীত আমার ছেলে; গজমোতি যে আনিয়াছে, সেই বসন্ত আমার ছেলে।'

শুনিয়া রাজকন্যা মাথা নামাইল।

১৩

পরদিন রূপবতী রাজকন্যা শীতরাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'দুয়ার খুলিয়া দিন, গজমোতি যিনি আনিয়াছেন তাঁহাকে গিয়া বরণ করিব।'

রাজা দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

বাদ্যভাণ্ড করিয়া রূপবতী রাজকন্যার পঞ্চ চৌদোলা শীতরাজার রাজ্যে পৌঁছিল।

শীতরাজার রাজদুয়ারে ডঙ্কা বাজিল, রাজপুরীতে নিশান উড়িল, রূপবতী রাজকন্যা বসন্তকে বরণ করিলেন।

শীত বলিলেন, 'ভাই, আমি তোমাকে পাইয়াছি, রাজ্য নিয়া কী করিব? রাজ্য তোমাকে দিলাম।' রাজপোশাক পরিয়া সোনার থালে গজমোতি রাখিয়া, বসন্ত-শীত সকলে রাজসভায় বসিলেন।

রাজকন্যার চৌদোলা রাজসভায় আসিল। চৌদোলায় রঙবিরঙের আঁকন; ময়ূরপাখার ঢাকন। ঢাকন খুলিতেই সকলে দেখে, ভিতরে এক যে স্বর্গের দেবী; রাজকন্যা রূপবতীকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন!

রমরমা সভা চুপ করিয়া গেল!

স্বর্গের দেবীর চোখে জল ছলছল ; রাজকন্যাকে চুমু খাইয়া চোখের জলে ভাসিয়া স্বর্গের দেবী ডাকিলেন, 'আমার শীত-বসন্ত কই রে !'

রাজসিংহাসন ফেলিয়া শীত উঠিয়া দেখেন, **মা** ! বসন্ত উঠিয়া দেখেন, **মা** ! সুয়োরানির ছেলেরা দেখেন, এই তাঁহাদের **দুয়ো-মা** ! সকলে পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া আসিলেন।

তখন রাজপুরির সকলে একদিকে চোখের জল মোছে আর-একদিকে পুরি জুড়িয়া বাদ্য বাজে।

শীত-বসন্ত বলিলেন, 'আহা, এ-সময় বাবা আসিতেন, সুয়ো-মা থাকিতেন !'

সুয়ো-মা মরিয়া গিয়াছে, সুয়ো-মা আর আসিল না। সকল শুনিয়া বনবাস ছাড়িয়া রাজা আসিয়া শীত-বসন্তকে বুকে লইলেন।

তখন রাজার রাজ্য ফিরিয়া আসিল, সকল রাজ্য এক হইল, পুরি আলো করিয়া রাজকন্যার গলায় গজমোতি ঝলমল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। দুঃখিনী দুয়োরানির দুঃখ ঘুচিল। রাজা, দুয়োরানি, শীত-বসন্ত, সুয়োরানির তিন ছেলে, রূপবতী রাজকন্যা—সকলে সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

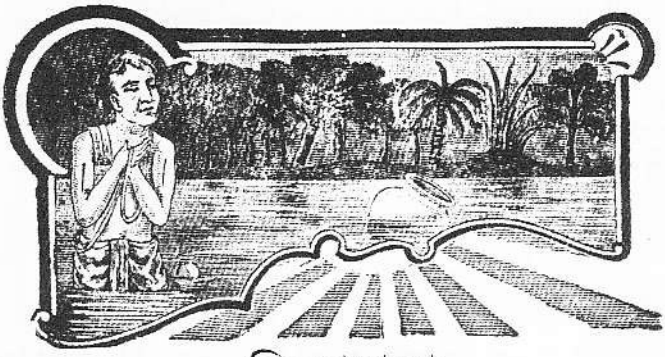

কিরণমালা

১

এক রাজা আর এক মন্ত্রী। একদিন রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, 'মন্ত্রী! রাজ্যের লোক সুখে আছে, কি দুঃখে আছে, জানিলাম না!'

মন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজ! ভয়ে বলি, কি, নির্ভয়ে বলি?'

রাজা বলিলেন, 'নির্ভয়ে বল!'

তখন মন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজ, আগে-আগে রাজারা মৃগয়া করিতে যাইতেন, দিনের বেলায় মৃগয়া করিতেন, রাত্র হইলে ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রজার সুখ-দুঃখ দেখিতেন। সে দিনও নাই, সে কালও নাই, প্রজার নানা অবস্থা।'

শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'এই কথা! কালই আমি মৃগয়ায় যাইব।'

২

রাজা মৃগয়া করিতে যাইবেন, রাজ্যে হুলুস্থুল পড়িল। হাতি সাজিল, ঘোড়া সাজিল, সিপাই সাজিল, সান্ত্রী সাজিল; পঞ্চকটক নিয়া রাজা মৃগয়ায় গেলেন।

রাজার তো নামে মৃগয়া। দিনের বেলায় মৃগয়া করেন—হাতিটা মারেন, বাঘটা মারেন; রাত হইলে রাজা ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রজার সুখ-দুঃখ দেখেন।

একদিন রাজা এক গৃহস্থের বাড়ির পাশ দিয়া যান; শুনিতে পাইলেন, ঘরের মধ্যে গৃহস্থের তিন মেয়েতে কথাবার্তা বলিতেছে।

রাজা কান পাতিয়া রহিলেন।

বড়বোন বলিতেছে, 'দ্যাখ লো, আমার যদি রাজবাড়ির ঘেসেড়ার সঙ্গে বিয়ে হয়, তো আমি মনের সুখে কলাই-ভাজা খাই!'

তার ছোটবোন বলিল, 'আমার যদি রাজবাড়ির সূপকারের (রাঁধুনের) সঙ্গে বিয়ে হয়, তো আমি সকলের আগে রাজভোগ খাই।'

সকলের ছোটবোন যে, সে আর কিছু কয় না; দুই বোনে ধরিয়া বসিল, 'কেন লো ছোট্টি! তুই যে কিছু বলিস্ না?'

ছোট্টি ছোট্ট করিয়া বলিল, 'না।'

দুই বোনে কি ছাড়ে? শেষে অনেকক্ষণ ভাবিয়া-টাবিয়া ছোটবোন বলিল, 'আমার যদি রাজার সঙ্গে বিয়ে হইত, তো আমি রানি হইতাম!'

সে কথা শুনিয়া দুই বোন 'হি! হি!' করিয়া উঠিল— 'ও মা, মা, পুঁটির যে সাধ!!'

শুনিয়া রাজা চলিয়া গেলেন!

৩

পরদিন রাজা দোলা-চৌদোলা দিয়া পাইক পাঠাইয়া দিলেন, পাইক গিয়া গৃহস্থের তিন মেয়েকে নিয়া আসিল।

তিন বোন তো কাঁপিয়া কুঁপিয়া অস্থির। রাজা অভয় দিয়া বলিলেন, 'কাল রাত্রে কে কী বলিয়াছিলে বল তো?'

কেহ কিচ্ছু কয় না!

শেষে রাজা বলিলেন, 'সত্য কথা যদি না বল তো বড়ই সাজা হইবে।'

তখন বড়বোন বলিল, 'আমি যে এই বলিয়াছিলাম।' মেজোবোন বলিল, 'আমি যে এই বলিয়াছিলাম।' ছোটবোন তবু কিছু বলে না।

তখন রাজা বলিলেন, 'দেখ, আমি সব শুনিয়াছি। আচ্ছা তোমরা যে যা হইতে চাহিয়াছ, তাহাই করিব।'

তাহার পরদিনই রাজা তিন বোনের বড়বোনকে ঘেসেড়ার সঙ্গে বিবাহ দিলেন, মেজোটিকে সূপকারের সঙ্গে বিবাহ দিলেন, আর ছোটটিকে রানি করিলেন।

তিন বোনের বড়বোন ঘেসেড়ার বাড়ি গিয়া মনের সাধে কলাই-ভাজা খায়; মেজোবোন রাজার পাকশালে সকলের আগে রাজভোগ খায় আর ছোটবোন রানি হইয়া সুখে রাজসংসার করেন।

৪

কয়েক বছর যায়; রানির সন্তান হইবে। রাজা রানির জন্য হীরার ঝালর, সোনার পাত, শ্বেতপাথরের নিগম ছাদ দিয়া আঁতুড়ঘর বানাইয়া দিলেন। রানি বলিলেন, 'কতদিন বোনদিগে দেখি না,—'মায়ের পেটের রক্তের বোন, আপন বলতে তিনটি বোন', সেই বোনদিগে আনাইয়া দিলে যে, তারাই আঁতুড়ঘরে যাইত!'

রাজা আর কী করিয়া 'না' করেন? বলিলেন, 'আচ্ছা।' রাজপুরি হইতে ঘেসেড়ার বাড়ি কানাতের পথ পড়িল, রাজপুরি হইতে রাঁধনের বাড়ি বাদ্যভাণ্ড বসিল; হাসিয়া-নাচিয়া দুই বোনে রানি-বোনের আঁতুড়ঘর আগলাইতে আসিল।

'ও মা!' আসিয়া দুজনে দেখে, রানি-বোনের যে ঐশ্বর্য!—

'হীরামোতি হেলে না, মাটিতে পা ফেলে না,
সকল পুরি গমগমা; সকল রাজ্য রমরমা।'

সেই রাজপুরিতে রানি-বোন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!! দেখিয়া দুই বোনে হিংসায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরে।

৫

রানি কি অত জানেন? দিনদুপুরে, দুইবোন এ-ঘর ও-ঘর, সাতঘর আঁদি সাঁদি ঘোরে। রানি জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন লো দিদি, কী চাস?' দিদিরা বলে, 'না, না, এই আঁতুড়ে কত কী লাগে, তাই জিনিসপাতি খুঁজি।' শেষে, বেলাবেলি দুই বোনে রানির আঁতুড়ঘরে গেল।

তিন প্রহর রাত্রে, আঁতুড়ঘরে, রানির ছেলে হইল। ছেলে যেন চাঁদের পুতুল! দুইবোনে তাড়াতাড়ি হাতিয়া-পাতিয়া কাঁচা মাটির ভাঁড় আনিয়া ভাঁড়ে তুলিয়া, মুখে নুন তুলা দিয়া, সোনার চাঁদ ছেলে নদীর জলে ভাসাইয়া দিল!

রাজা খবর করিলেন, 'কী হইয়াছে?'

'ছাই! ছেলে না ছেলে— কুকুরের ছানা!' দুইজনে আনিয়া এক কুকুরের ছানা দেখাইল। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

তার পর-বছর রানির আবার ছেলে হইবে। আবার দুই বোনে আঁতুড়ঘরে গেল।

রানির আর-এক ছেলে হইল। হিংসুকে দুই বোন আবার তেমনি করিয়া মাটির ভাঁড়ে করিয়া, নুন তুলা দিয়া ছেলে ভাসাইয়া দিল।

রাজা খবর নিলেন— 'এবার কী ছেলে হইয়াছে?'

'ছাই! ছেলে না ছেলে—বিড়ালের ছানা!' দুই বোনে আনিয়া এক বিড়ালের ছানা দেখাইল!

রাজা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না!

তার পরের বছর রানির এক মেয়ে হইল। টুকটুকে মেয়ে, টুলটুলে মুখ, হাত-পা যেন ফুল-তুকতুক! হিংসুকে দুই বোনে সে মেয়েকেও নদীর জলে ভাসাইয়া দিল।

রাজা আবার খবর নিলেন—'এবার কী?'

'ছাই! কী না কী— এক কাঠের পুতুল।' দুই বোনে রাজাকে আনিয়া এক কাঠের পুতুল দেখাইল! রাজা দুঃখে মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজ্যের লোক বলিতে লাগিল—'ও মা! এ আবার কী! অদিনে কুক্ষণে রাজা না-জানা না-শোনা কী এক আনিয়া বিয়ে করিলেন—এক নয়, দুই নয়, তিন-তিন বার ছেলে হইল—কুকুর-ছানা, বিড়াল-ছানা আর কাঠের পুতুল! এ অলক্ষুণে রানি কখখনো মনিষ্যি নয় গো, মনিষ্যি নয়— নিশ্চয় পেতনি কি ডাকিনী।'

রাজাও ভাবিলেন—'তাই তো! রাজপুরিতে কী অলক্ষ্মী আনিলাম—যাক এ রানি আর ঘরে নিব না।'

হিংসুকে দুই বোনে মনের সুখে হাসিয়া গলিয়া, পানের পিক ফেলিয়া, আপনার আপনার বাড়ি গেল।

রাজ্যের লোকেরা ডাকিনী রানিকে উল্টাগাধায় উঠাইয়া, মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, রাজ্যের বাহির করিয়া দিয়া আসিল।

৬

এক ব্রাহ্মণ নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন— স্নানটান সারিয়া, ব্রাহ্মণ জলে দাঁড়াইয়া জপ-আহ্নিক করেন, দেখিলেন এক মাটির ভাঁড় ভাসিয়া আসে। না—ভাঁড়ের মধ্যে সদ্য ছেলের কান্না শোনা যায়। আঁকুপাঁকু করিয়া ব্রাহ্মণ ভাঁড় ধরিয়া দেখেন—এক দেবশিশু!

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি করিয়া মুখের নুন, তুলা ধোয়াইয়া শিশুপত্র নিয়া ঘরে গেলেন।

তারপরের বছর আর এক মাটির ভাঁড় ভাসিয়া ভাসিয়া সেই ব্রাহ্মণের ঘাটে আসিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন আর-এক দেবপুত্র! ব্রাহ্মণ সেই দেবপুত্রও নিয়া ঘরে তুলিলেন।

তিন বছরের বছর আবার এক মাটির ভাঁড় ব্রাহ্মণের ঘাটে গেল। ব্রাহ্মণ ভাঁড় ধরিয়া দেখেন—এবার দেবকন্যা! ব্রাহ্মণের বেটা নাই, পুত্র নাই—তার মধ্যে দুই দেবপুত্র, আবার দেবকন্যা! ব্রাহ্মণ আনন্দে কন্যা নিয়া ঘরে গেলেন।

হিংসুক মাসিরা ভাসাইয়া দিয়াছিল, ভাসানে রাজপুত্র রাজকন্যা গিয়া ব্রাহ্মণের ঘর আলো করিল। রাজার রাজপুরিতে আর বাতিটুকুও জ্বলে না।

৭

ছেলেমেয়ে নিয়া ব্রাহ্মণ পরম সুখে থাকেন। ব্রাহ্মণের চাটিমাটির দুঃখ নাই, গোলা-গঞ্জের অভাব নাই। ক্ষেতের ধান, গাছের ফল, কলস কলস গঙ্গাজল, ডোল-ভরা মুগ, কাজললতা গাইয়ের দুধ—ব্রাহ্মণের টাকা পেটরায় ধরে না।

তা হইলে কী হয়। 'কাহন কড়ি কে বা পুছে, কে বা বুড়ির চক্ষু মুছে'—ব্রাহ্মণের না ছিল ছেলে, না ছিল পুত্র। এতদিনে বুঝি পরমেশ্বর ফিরিয়া চাহিলেন—ব্রাহ্মণের ঘরে সোনার চাঁদের ভরাবাজার! খাওয়া নাই, নাওয়া নাই, ব্রাহ্মণ দিনরাত ছেলেমেয়ে নিয়া থাকেন। ছেলে দুইটির নাম রাখিলেন—অরুণ, বরুণ; আর মেয়ের নাম রাখিলেন—

কিরণমালা।

দিন যায়, রাত যায়—অরুণ, বরুণ, কিরণমালা চাঁদের মতো বাড়ে, ফুলের মতোন ফোটে। অরুণ, বরুণ, কিরণের হাসি শুনিলে বনের পাখি আসিয়া গান ধরে, কান্না শুনিলে বনের হরিণ ছুটিয়া আসে। হেলিয়া দুলিয়া খেলে—তিন ভাই-বোনের নাচে ব্রাহ্মণের আঙিনায় চাঁদের হাট ভাঙিয়া পড়িল!

দেখিতে দেখিতে তিন ভাই-বোন বড় হইল। কিরণমালা বাড়িতে কুটাটুকু পড়িতে দেয় না, কাজললতা গাইয়ের গায়ে মাছিটি বসিতে দেয় না। অরুণ, বরুণ দুই ভাইয়ে পড়ে; শোনে; ফল পাকিলে ফল পাড়ে; বনের হরিণ দৌড়ে ধরে। তারপর তিন ভাই-বোনে মিলিয়া ডালায় ডালায় ফুল তুলিয়া ঘরবাড়ি সাজাইয়া আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

ব্রাহ্মণের আর কী! কিরণমালা মায়ে ডালিভরা ফুল আনে, দীপ চন্দন দেয়। ধুপ জ্বালাইয়া ঘণ্টা নাড়িয়া ব্রাহ্মণ 'বম-বম' করিয়া পূজা করেন!

এমনি করিয়া দিন যায়। অরুণ-বরুণ, ব্রাহ্মণের সকল বিদ্যা পড়িলেন; কিরণমালা ব্রাহ্মণের ঘর-সংসার হাতে নিলেন।

তখন একদিন তিন ছেলে-মেয়ে ডাকিয়া, তিনজনের মাথায় হাত রাখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'অরুণ, বরুণ, মা কিরণ, সব তোদের রহিল; আমার আর কোনো দুঃখ নাই, তোমাদিগে রাখিয়া এখন আমি আর-এক রাজ্যে যাই; সব দেখিয়া শুনিয়া খাইও।' তিন ভাই-বোনে কাঁদিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

৮

মনের দুঃখে মনের দুঃখে দিন যায়—রাজার রাজপুরি অন্ধকার। রাজা বলিলেন, 'না! আমার রাজত্ব পাপে ঘিরিয়াছে। চল, আবার মৃগয়ায় যাইব।' আবার রাজপুরিতে মৃগয়ার ডঙ্কা বাজিল।

রাজা মৃগয়ায় গিয়াছেন আর সেই দিন আকাশের দেবতা ভাঙিয়া পড়িল।

ঝড়ে-তুফানে, বৃষ্টি-বাদলে সঙ্গীসাথি ছাড়াইয়া, পথ-পাথার হারাইয়া—ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, ঝম ঝম বৃষ্টি—বৃক্ষের কোটরে রাজা রাত্রি কাটাইলেন।

পরদিন রাজা হাঁটেন, হাঁটেন, পথের শেষ নাই। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ, দিকদিশা খাঁ খাঁ; জনমনুষ্য কোথায়, জলজলাশয় কোথায়—হাঁপিয়া জাপিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আকুল রাজা, দেখেন—দূরে এক বাড়ি। রাজা সেই বাড়ির দিকে চলিলেন।

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা তিন ভাই-বোন দেখে—কী! এক যে মানুষ, তাঁর হাতে-পায়ে, গায়ে-মাথায় চিকমিক! দেখিয়া, অরুণ-বরুণ অবাক হইল, কিরণ গিয়া দাদার কাছে দাঁড়াইল।

রাজা ডাকিয়া বলিলেন, 'কে আছ, একটুকু জল দিয়া বাঁচাও।'

ছুটিয়া গিয়া ভাই-বোন জল আনিল। জল খাইয়া অবাক রাজা, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবপুত্র, দেবকন্যা—বিজন দেশে তোমরা কে?'

অরুণ বলিল, 'আমরা ব্রাহ্মণের ছেলেমেয়ে!'

রাজার বুক ধুকুধুকু, রাজার মন উসুখুসু—'ব্রাহ্মণের ঘরে এমন ছেলে-মেয়ে হয়!' কিন্তু রাজা কিছু বলিতে পারিলেন না; চাহিয়া চাহিয়া, দেখিয়া দেখিয়া, শেষে চক্ষের জল পড়ে-পড়ে। রাজা বলিলেন, 'আমি জল খাইলাম না, দুধ খাইলাম! দেখ বাছারা, আমি এই দেশের দুঃখী রাজা। কখনো তোমাদের কোনোকিছুর জন্য যদি কাজ পড়ে, আমাকে জানাইও, আমি তা করিব।' বলিয়া রাজা নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিলেন।

তখন কিরণ বলিল, 'দাদা! রাজার কী থাকে?'

অরুণ, বরুণ বলিল, 'তা তো জানি না বোন—শুধু পুঁথিতে আছে যে, রাজার হাতি থাকে, ঘোড়া থাকে, অট্টালিকা থাকে।'

কিরণ বলিল, 'হাতি-ঘোড়া কোথায় পাই; অট্টালিকা বানাও।'

অরুণ, বরুণ বলিল, **'আচ্ছা।'**

৯

'আচ্ছা'—দিন কোথায় দিয়া যায়, রাত্রি কোথায় দিয়া যায়, কোন্ রাজ্য থেকে কী আনে, মাথার ঘাম মাটিতে পড়ে; ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই; বারো মাস ছত্রিশ দিন চাঁদ-সূর্য ঘুরে আসে; অরুণ বরুণ যে, অট্টালিকা বানায়। অরুণ-বরুণ কাজ করে, কিরণমালা বোন ভরা-ঘাটের ধরা জল হাঁড়িতে হাঁড়িতে ভরিয়া আনিয়া দেয়। বারো মাস, ছত্রিশ দিনে সেই অট্টালিকা তৈয়ার হইল।

সে অট্টালিকা দেখিয়া ময়দানব উপোস করে, বিশ্বকর্মা ঘর ছাড়ে—অরুণ, বরুণ, কিরণের অট্টালিকা সূর্যের আসন ছোঁয়, চাঁদের আসন কাড়ে! শ্বেতপাথর ধবধব, শ্বেতমানিক রব্ রব্, দুয়ারে দুয়ারে রুপার কবাট, চূড়ায় সোনার কলসি! অট্টালিকার চারিদিকে ফুলের গাছ, ফলের গাছ—পক্ষী-পাখালিতে আঁটে না। মধুর গন্ধে অট্টালিকা ভুরভুর, পাখির ডাকে অট্টালিকা মধুরপুর! অরুণ, বরুণ, কিরণের বাড়ি দেবে দৈত্যে চাহিয়া দেখে।

একদিন এক সন্ন্যাসী নদীর ওপার দিয়া যান। যাইতে যাইতে সন্ন্যাসী বলেন,

'বিজন দেশের বিজন বনে কে-গো বোন-ভাই?
কে গড়েছ, এমন পুরি, তুলনা তার নাই।'

পুরি হইতে অরুণ বলিলেন :

'নিত্য নূতন চাঁদের আলো আপনি এসে পড়ে,
অরুণ, বরুণ, কিরণমালা ভাই-বোনটির ঘরে!'

সন্ন্যাসী বলিলেন :

'অরুণ, বরুণ, কিরণমালার রাঙা রাজপুরি
দেখতে সুখ শুনতে সুখ, ফুটত আরো ছিরি।
এমন পুরি আরো কত হত মনোলোভা,
কী যেন চাই, কী যেন নাই, তাইতে না হয় শোভা।

এমন পুরি, রুপার গাছে ফলবে সোনার ফল।
ঝরঝরিয়ে পড়বে ঝরে মুক্তা-ঝরার জল।
হীরার গাছে সোনার পাখির শুনব মধুস্বর—
মানিক-দানা ছড়িয়ে রবে পথের কাঁকর।
তবে এমন পুরি হবে তিন ভুবনের সার,
সোনার পাখির এক-এক ডাকে সুখের পাথার।'

শুনিয়া অরুণ, বরুণ, কিরণ ডাকিয়া বলিলেন :

'কোথায় এমন রুপার গাছ,
কোথায় এমন পাখি,
কেমন সে মুক্তা-ঝরা,
বললে এনে রাখি।'

সন্ন্যাসী বলিলেন :

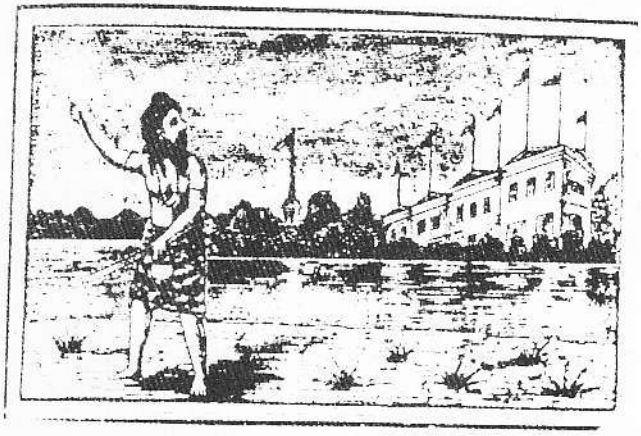

উত্তর পুব, পুবের উত্তর, মায়াপাহাড় আছে

'উত্তর পুব, পুবের উত্তর
মায়া-পাহাড় আছে,
নিত্য ফলে সোনার ফল
সত্যি হীরার গাছে।

ঝরঝরিয়ে মুক্তা-ঝরা
শীতল বয়ে যায়,
সোনার পাখি বসে আছে
বৃক্ষের শাখায়!
মায়ার পাহাড় মায়ায় ঢাকা
মায়ায় মারে তীর—
এ সব যে আনতে পারে
সে বড় বীর!'

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

অরুণ-বরুণ বলিলেন, 'বোন, আমরা এসব আনিব।'

১০

অরুণ বলিলেন, 'ভাই বরুণ, বোন কিরণ, তোরা থাক্, আমি মায়া-পাহাড়ে গিয়া সব নিয়া আসি।' বলিয়া অরুণ; বরুণ ও কিরণের কাছে এক তরোয়াল দিলেন—'যদি দেখ যে, তরোয়ালে মরিচা ধরিয়াছে, তো জানিও আমি আর বাঁচিয়া নাই।' তরোয়াল রাখিয়া অরুণ চলিয়া গেলেন।

দিন যায়, মাস যায়—বরুণ-কিরণ রোজ তরোয়াল খুলিয়া খুলিয়া দেখেন। একদিন, তরোয়াল খুলিয়া বরুণের মুখ শুকাইল, ডাক দিয়া বলিলেন, 'বোন, দাদা আর এ-সংসারে নাই! এই তীর-ধনুক রাখো, আমি চলিলাম। যদি তীরের আগা খসে, ধনুর ছিলা ছিঁড়ে, তো জানিও আমিও নাই।'

কিরণমালা অরুণের তরোয়ালে মরিচা দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির। বরুণের তীর-ধনুক তুলিয়া নিয়া বলিল, 'হে ঈশ্বর। বরুণ দাদা যেন অরুণ দাদাকে নিয়া আসে!'

১১

যাইতে যাইতে বরুণ মায়া-পাহাড়ের দেশে গেলেন। অমনি চারিদিকে বাজনা বাজে, অপ্সরী নাচে—পিছন হইতে ডাকের উপর ডাক : 'রাজপুত্র! রাজপুত্র! ফিরে চাও! ফিরে চাও! কথা শোন!'

বরুণ ফিরিয়া চাহিতেই পাথর হইয়া গেলেন—'হায়! দাদাও আমার পাথর হইয়াছেন।'

আর হইয়াছেন;—কে আসিয়া উদ্ধার করিবে? অরুণ, বরুণ জন্মের মতো পাথর হইয়া রহিলেন।

ভোরে উঠিয়া কিরণমালা দেখেন—তীরের ফলা খসিয়া গিয়াছে, ধনুর ছিলা ছিঁড়িয়া গিয়াছে—অরুণ দাদা গিয়াছে, বরুণ দাদাও গেল। কিরণমালা কাঁদিল না, কাটিল না, চক্ষের জল মুছিল না; উঠিয়া কাজললতাকে খড়-খৈল দিল, গাছগাছালির গোড়ায় জল দিল। দিয়া—রাজপুত্রের পোশাক পরিয়া, মাথে মুকুট, হাতে তরোয়াল—কাজললতার বাছুরকে, হরিণের ছানাকে চুমু খাইয়া, চক্ষের পলক ফেলিয়া কিরণমালা মায়া-পাহাড়ের উদ্দেশে বাহির হইল।

যায়, যায়—কিরণমালা আগুনের মতো উঠে, বাতাসের আগে ছুটে; কে দেখে, কে না-দেখে! দিন রাত্রি, পাহাড় জঙ্গল, রোদ বান সকল লুটাপুটি গেল; ঝড় থমকাইয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া তেরো রাত্রি তেত্রিশ দিনে কিরণমালা পাহাড়ে গিয়া উঠিলেন।

অমনি চারিদিক দিয়া দৈত্য-দানা, বাঘ, ভালুক, সাপ, হাতি, সিংহ, মোষ, ভূত-পেতনিতে আসিয়া কিরণমালাকে ঘিরিয়া ধরিল।

এ ডাকে : 'রাজপুত্র, তোকে গিলি !'
ও ডাকে : 'রাজপুত্র তোকে খাই !'
'হাম——হুম !——হাঁই !'
'হুম —— হম ——হঃ !'
'হুম ! —— হাম —— !'
'ঘঁঃ !'——

পিঠের উপর বাজনা বাজে : 'তা কাটা ধা কাটা
ভ্যাং ভ্যাং চ্যাং—
রাজপুত্রের কেটে নে
ঠ্যাং !'

করতাল ঝন ঝন—
খরতাল খনখন—
ঢাক-ঢোল, মৃদঙ্গ কাড়া—
ঝকঝক তরোয়াল, তর তর খাঁড়া—।

অপ্সরা নাচে : 'রাজপুত্র, রাজপুত্র, এখনো শোন !'

মায়ার তীর—ধনুকে ধনুকে টানে গুণ।

উপরে বৃষ্টি বজ্রের ধারা, মেঘের গর্জন লক্ষ কাড়া—শব্দে, রবে আকাশ ফাটিয়া পড়ে; পাহাড় পর্বত উল্টে, পৃথিবী চৌচির যায় ! সাত পৃথিবী থরথর কম্পমান —বাজ, বজ্র,—শিল চমক——।

* * * * *

নাহ্ ! কিছুতেই কিছু না ! সব বৃথায়, সব মিছায় ! কিরণমালা তো রাজপুত্র নন, কিরণমালা কোনোদিকে ফিরিয়া চাহিল না। পায়ের নিচে কত পাথর টলে গেল, কত পাথর গলে গেল, চক্ষের পাতা নামাইয়া তরোয়াল শক্ত করিয়া ধরিয়া শোঁ-শোঁ করিয়া কিরণমালা সরসর একেবারে সোনার ফল হীরার গাছের গোড়ায় গিয়া পৌঁছিল।

আর অমনি হীরার গাছে সোনার পাখি বলিয়া উঠিল —'আসিয়াছ? আসিয়াছ? ভালোই হইয়াছে। এই ঝরনার জল নাও, এই ফুল নাও, আমাকে নাও, ওই যে তীর আছে নাও, ওই যে ধনুক আছে নাও, নাও, নাও, দেরি করিও না ; সব নিয়া ওই-যে ডঙ্কা আছে, ডঙ্কায় ঘা দাও।'

পাখি এক-এক কথা বলে, কিরণমালা এক-এক জিনিশ নেয়। নিয়া গিয়া কিরণমালা ডঙ্কায় ঘা দিল।

সব চুপচাপ ! মায়া পাহাড় নিঝুম। খালি কোকিলের ডাক, দোয়েলের শিস, ময়ূরের নাচ !

তখন পাখি বলিল, 'কিরণমালা, শীতল ঝরনার জল ছিটাও।'

কিরণমালা সোনার ঝারি ঢালিয়া জল ছিটাইলেন। চারিদিকে পাহাড় মড়মড় করিয়া উঠিল, সকল পাথর টক-টক করিয়া উঠিল—যেখানে জলের ছিটা-ফোঁটা পড়ে, যত যুগের যত রাজপুত্র আসিয়া পাথর হইয়াছিলেন, চক্ষের পলকে গা-মোড়া দিয়া উঠিয়া বসেন।

দেখিতে দেখিতে সকল পাথর লক্ষ লক্ষ রাজপুত্র হইয়া গেল। রাজপুত্রেরা জোড়হাত করিয়া কিরণমালাকে প্রণাম করিল :

'সাত যুগের ধন্য বীর !'

অরুণ, বরুণ চোখের জলে গলিয়া বলিলেন, 'মায়ের পেটের ধন্য বোন।'

মাথার উপর সোনার পাখি বলিল :

'অরুণ, বরুণ, কিরণমালা
তিনটি ভুবন করলি আলা।'

১২

পুরিতে আসিয়া অরুণ, বরুণ, কিরণমালা কাজললতাকে ঘাস জল দিলেন, কাজললতার বাছুর খুলিয়া দিলেন, হরিণছানা নাওয়াইয়া দিলেন, আঙিনা পরিষ্কার করিলেন, গাছের গোড়ায় গোড়ায় জল দিলেন, জঞ্জাল নিলেন— দিয়া-নিয়া, বাগানে রুপার গাছের বীজ, হীরার গাছের ডাল পুঁতিলেন, মুক্তাঝরনাজলের ঝারির মুখ খুলিলেন, মুক্তার ফুল ছড়াইয়া দিলেন ; সোনার পাখিকে বলিলেন, 'পাখি ! এখন গাছে বস।'

তরতর করিয়া হীরার গাছ বড় হইল, ফরফর করিয়া রুপার গাছ পাতা মেলিল; রুপার ডালে, হীরার শাখে টুকটুকেটুক সোনার ফল থোবায় থোবায় দুলিতে লাগিল; হীরার ডালে সোনার পাখি বসিয়া হাজার সুরে গান ধরিল। চারিদিকে মুক্তার ফল থরে থরে চমচম—তারি মধ্যে শীতল ঝরনায় মুক্তার জল ঝরঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল।

পাখি বলিল, 'আহা !'

অরুণ, বরুণ, কিরণ—তিন ভাইবোনে গলাগলি করিলেন।

১৩

বনের পাখি পারে না, বনের হরিণ পারে না, তা মানুষে কি থাকিতে পারে? ছুটিয়া আসিয়া দেখে— 'আহ্ ! পুরি যে পুরি, ইন্দ্রপুরি পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে।'

খবর রাজার কাছে গেল। শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'তাই নাকি ! সে ব্রাহ্মণের ছেলেরা এমন সব করিল !'

সেই রাতে সোনার পাখি বলিল, 'অরুণ, বরুণ, কিরণমালা ! রাজাকে নিমন্ত্রণ কর !'

তিন ভাই-বোন বলিলেন, 'সে কী ! রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া কী খাওয়াইব?'

পাখি বলিল, 'সে আমি বলিব !'

অরুণ-বরুণ ভোরে গিয়া রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

সোনার পাখি বলিল, 'কিরণ ! রাজামহাশয় যেখানে খাইতে বসিবেন, সেই ঘরে আমাকে টাঙাইয়া দিও।'

কিরণ বলিল, 'আচ্ছা।'

১৪

ঠাট কটক নিয়া, জাঁকজমক করিয়া রাজা নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া দেখেন—কী ! রাজা আসিয়া দেখেন আর চমকেন ; দেখেন, দেখেন আর 'থ' খান। পুরির কানাচে-কোণে যা, রাজভাণ্ডার ভরিয়াও তা নাই। 'এসব এরা কোথায় পাইল? এরা কি মানুষ ! হায় !' একবার রাজা আনন্দে হাসেন, আবার রাজা দুঃখে ভাসেন—আহা, ইহারাই যদি তাঁহার ছেলেমেয়ে হইত !

রাজা বাগান দেখিলেন, ঝরনা দেখিলেন ; দেখিয়া শুনিয়া সুখে-দুঃখে রাজার চোখ ফাটিয়া জল আসে, চোখে হাত দিয়া রাজা বলিলেন, 'আর তো পারি না। ঘরে চল।'

ঘরে এদিকে মণি, ওদিকে মুক্তা, এখানে পান্না, ওখানে হীরা। রাজা অবাক !

তারপর রাজা খাবারঘরে। রকমে রকমে খাবার জিনিশ থালে থালে, রেকাবে রেকাবে, বাটিতে বাটিতে ভারে-ভারে রাজার কাছে আসিল ! সুবাসে সুগন্ধে ঘর ভরিয়া গেল।

আশ্চর্যে, বিস্ময়ে রাজা আস্তে আস্তে আসিয়া আসন নিলেন। আস্তে আস্তে অবাক রাজা, থালে হাত দিয়াই—

রাজা হাত তুলিয়া বসিলেন ! —

—**'এ কী ! সব যে মোহরের !'**

'তাহাতে কী ?'

রাজা : 'একি খাওয়া যায় ?'

'কেন যাইবে না ? পায়েশ, পিঠা, ক্ষীর, সর, মিঠাই, মণ্ডা, রস, লাড়ু—খাওয়া যাইবে না ?'

কে এ কথা বলে

রাজা বলিলেন, 'কে কথা বলে ? অরুণ, বরুণ, কিরণ ! তোমরাও কি আমার সঙ্গে তামাশা করিতেছ ? মোহরের পায়েশ, মোতির পিঠা, মুক্তার মিঠাই, মণির মণ্ডা এসব মানুষে কেমন করিয়া খাইবে ? এ কি খাওয়া যায় ?'

মাথার উপর হইতে কে বলিল, 'মানুষের কি কুকুর-ছানা হয়?'

'—অ্যাঁ—'

'রাজা মহাশয়, মানুষের কি বিড়াল-ছানা হয়?'

'—অ্যাঁ!' —রাজা চমকিয়া উঠিলেন! দেখিলেন, সোনার পাখিতে বলিতেছে, 'মহারাজ, এসব যদি মানুষে খাইতে না পারে, তো মানুষের পেটে কাঠের পুতুল কেমন করিয়া হয়?'

রাজা বলিলেন, 'তাই তো, তাই তো—আমি কী করিয়াছি!!' রাজা আসন ছাড়িয়া উঠিলেন।

সোনার পাখি বলিল, 'মহারাজ, এখন বুঝিলেন? ইহারাই আপনার ছেলেমেয়ে। দুষ্টু মাসিরা মিথ্যা করিয়া কুকুর-ছানা, বিড়াল-ছানা, কাঠের পুতুল দেখাইয়াছিল।'

রাজা থরথর কাঁপিয়া, চোখের জলে ভাসিয়া, অরুণ-বরুণ-কিরণকে বুকে নিলেন। হায়! দুঃখিনী রানি যদি আজ থাকিত!'

সোনার পাখি চুপি চুপি বলিল, 'অরুণ, বরুণ, কিরণ! নদীর ওপারে যে কুঁড়ে, সেই কুঁড়েতে তোমাদের মা থাকেন, বড় দুঃখে মর-মর হইয়া তোমাদের মায়ের দিন যায়; গিয়া তাঁহাকে নিয়া আইস।'

তিন ভাইবোন অবাক হইয়া চোখের জলে গলিয়া মাকে নিয়া আসিল।

দুঃখিনী মা ভাবিল, 'আহা স্বর্গে আসিয়া বাছাদের পাইলাম!'

সোনার পাখি গান করিল :

'অরুণ, বরুণ, কিরণ,
তিন ভুবনের তিন ধন।
এমন রতন হারিয়ে, ছিল
মিছাই জীবন।
অরুণ, বরুণ, কিরণমালা
আজ ঘুচালি সকল জ্বালা।

তারপর আর কী! আনন্দের হাট বসিল। রাজা রাজত্ব তুলিয়া আনিয়া, অরুণ-বরুণ-কিরণের পুরিতে রাজপাট বসাইয়া দিলেন। সকল প্রজা সাত দিন, সাত রাত্রি ধরিয়া মণি-মুক্তা, হীরা-পান্না নিয়া হুড়াহুড়ি খেলিল।

তারপর আর এক দিন, রাজ্যের কতকগুলো জল্লাদ হৈ হৈ করিয়া গিয়া ঘেসেড়ার বাড়ি, সূপকারের বাড়ি জ্বালাইয়া দিয়া, রানির পোড়ামুখি দুই বোনকে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিয়া চলিয়া আসিল।

তারপর রাজা-রানি, অরুণ-বরুণ, কিরণমালা, নাতি-নাতকুড় লইয়া কোটি-কোটিশ্বর হইয়া যুগ-যুগ সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

'রূপ-তরাসী'

'হাঁ—উ মাঁ—উ কাঁ—উ' শুনি রাক্ষসেরি পুর
না জানি সে কোন্ দেশে—না জানি কোন্ দূর।

* * *

রূপ দেখতে তরাস লাগে বলতে করে ভয়,
কেমন করে রাক্ষসীরা মানুষ হয়ে রয়!
চ—প্ চ—প্ চিবিয়ে খেলে আপন পেটের ছেলে,
সোনার ডিম লোহার ডিম কৃষাণ কোথায় পেলে।
কেমন করে ধ্বংস হল খোক্কসের পাল—
কেমন করে উঠল কেঁপে নেঙ্গা তরোয়াল!

পায়ের নিচে কড়ির পাহাড় হাড়ের পাহাড় চুর—
রাজপুত্র কে গিয়েছে পাশাবতীর পুর?
হিল হিল হিল কালনিশিতে—গর্জে কোথায় সাপ—
রাজার পুরির ধ্বংস কোথায় হাজার সিঁড়ির ধাপ!

আকাশ পাতাল সাপের হা কোথায় পাহাড় বন,
থর থর থর গাছের ডালে বন্ধু দু-জন!
চরকা কোথায় ঘ্যাঁঘর ঘ্যাঁঘর—পেঁচার কিবা রূপ—
মণির আলোয় কোন্ কন্যার অগাধ জলে ডুব!

কবে কোথায় চার বন্ধুতে হল ঘরের বার—
'হি হি হি!' হরিণ-মাথা রাক্ষস আকার।
আমের ভিতর রাজার ছেলে লুকিয়ে ছিল কে,
রাজকন্যা নিয়ে এল সাগর পারে গে!
কবে কোথায় রাক্ষসীর হাড় মুড় মুড় করে
রাজার ছেলের রসাল কচি মুণ্ডু খাবার তরে!
রাক্ষসের বংশ উজাড় রাজপুত্রের হাতে—
লেখা ছিল সে-সব কথা 'রূপ-তরাসী'র পাতে?

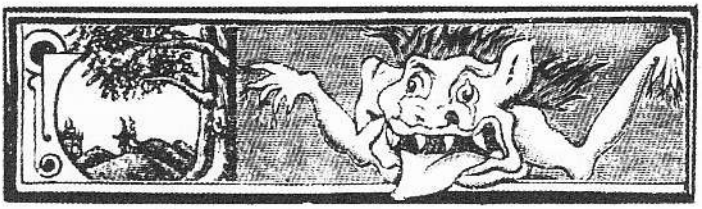

নীলকমল আর লালকমল

২

এক রাজার দুই রানি; তাহার এক রানি যে রাক্ষসী! কিন্তু এ-কথা কেহই জানে না।

দুই রানির দুই ছেলে—

লক্ষ্মী মানুষ-রানির ছেলে কুসুম, আর রাক্ষসী-রানির ছেলে অজিত। অজিত, কুসুম দুই ভাই গলাগলি।

রাক্ষসী-রানির মনে কাল, রাক্ষসী-রানির জিভে লাল। রাক্ষসী কি তাহা দেখিতে পারে? কবে সতিনের ছেলের কচি কচি হাড়-মাংসে ঝোল-অম্বল রাঁধিয়া খাইবে—তা পেটের দুষ্টু ছেলে সতিন-পুতের সাথ ছাড়ে না। রাগে রাক্ষসীর দাঁতে-দাঁতে কড়কড় পাঁচ পরান সরসর।

জো না-পাইয়া রাক্ষসী ছুতানাতা খোঁজে, চোখের দৃষ্টি দিয়া সতিনের রক্ত শোষে। দিন দণ্ড যাইতে-না-যাইতে লক্ষ্মীরানি শয্যা নিলেন। তখন ঘোমটার আড়ে জিভ কলকল, আনাচে-কানাচে উঁকি।

[জিভ লকলক]

দুই দিনের দিন লক্ষ্মীরানির কাল হইল। রাজ্য শোকে ভাসিল। কেউ কিচ্ছু বুঝিল না।

অজিতকে 'সরসর'—কুসুমকে 'মর মর' রাক্ষসী সতিন-পুতকে তিন ছত্রিশ গালি দেয়, আপন পুতকে ঠোনা মারিয়া খেদায়। দাদাকে নিয়া গিয়া অজিত নিরালায় চোখের জল মুছায়—'দাদা, আর থাক, আর আমরা মা'র কাছে যাব না।' রাক্ষসী-মা'র কাছে আর কেহই যায় না! লোহার প্রাণ অজিত সব সয়; সোনার প্রাণ কুসুম ভাঙিয়া পড়ে। দিনে দিনে কুসুম শুকাইতে লাগিল।

২

রানি দেখিল—

'কী! আপন পেটের পুত্র,
সে-ই হইল শত্রু!—
রানির মনের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

এক রাত্রে রাজার হাতিশালে হাতি মরিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরিল, গোহালে গরু মরিল—রাজা ফাঁপরে পড়িলেন।

পর রাত্রে রাজার ঘরে 'কাঁই মাঁই!' চমকিয়া রাজা তরোয়াল নিয়া উঠিলেন। সোনার খাটে অজিত-কুসুম ঘুমায়; এক মস্ত রাক্ষস কুসুমকে ধরিয়া আনিল। রাক্ষসের হাতে কুসুম কাঠির পুতুল! রানি ছুটিয়া আসিয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া রাজার গায়ে মারিল—হাত নড়ে না, পা নড়ে না। রাজা বোকা হইয়া গেলেন।

রাজার চোখের সামনে রাক্ষস কুসুমকে খাইতে লাগিল। রাজা চোখের জলে ভাসিয়া গেলেন, মুছিতে পারিলেন না। রাজার শরীর থরথর কাঁপে, রাজা বসিতে পারিলেন না! রানি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অজিতের ঘুম ভাঙিল—

রাত যেন নিশে
মন যেন বিষে,
দাদা কাছে নাই কেন?

অজিত ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখে—ঘর ছমছম করিতেছে, রানির হাতে বালা-কাঁকন ঝমঝম করিতেছে—দাদাকে রাক্ষসে খাইতেছে! গায়ের রোমে কাঁটা, চোখের পলক ভাঁটা, অজিত ছুটিয়া গিয়া রাক্ষসের মাথায় এক চড় মারিল। রাক্ষস 'আঁই আঁই' করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া এক সোনার ডেলা উগারিয়া পলাইয়া গেল!

রানি দেখিল, পৃথিবী উল্টিয়াছে—পেটের ছেলে শত্রু হইয়াছে! রানি মনের আগুনে জ্ঞান-দিশা হারাইয়া আপনার ছেলেকে মুড়মুড় করিয়া চিবাইয়া খাইল! রানির গলা দিয়া এক লোহার ডেলা গড়াইয়া পড়িল।

রানির পা উছল, রানির চোখ 'উখর'; সোনার ডেলা, লোহার ডেলা নিয়া রানি ছাদে উঠিল।

ছাদে রাক্ষসের হাট। একদিকে বলে—

'হুঁম হুঁম খাম—আঁরো খাঁবো।'

আর দিকে বলে,

'গুম গুম গাম—দেঁশে যাঁবো।'

রানি বলিল,

'গব গব গুম, খম খম খাঃ!
আমি হেঁথা থাকি, তোঁরা দেশে যাঃ!'

রাজপুরির চূড়া ভাঙিয়া পড়িল, রাজার বুক কাঁপিয়া উঠিল—গাছপাথর মুচড়িয়া, নদীর জল উছলিয়া রাক্ষসের ঝাঁক দেশে ছুটিল।

ঘরে গিয়া রানির গা জ্বলে, পা জ্বলে, রানি সোয়াস্তি পায় না। বহিরে গিয়া রানির মন ছন ছন, বুক কনকন; রাত আর পোহায় না।

না পারিয়া রানি আরাম-কাঠি, জিরাম-কাঠি বাহির করিয়া পোড়াইয়া ফেলিল। তাহার পর, মায়া-মেঘে উঠিয়া, নদীর ধারে এক বাঁশ-বনের তলে সোনার ডেলা, লোহার ডেলা পুঁতিয়া রাখিয়া, রাক্ষসী-রানি নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

বাঁশের আগে যে কাক ডাকিল, ঝোপের আড়ে যে শিয়াল কাঁদিল, রানি তাহা শুনিতে পাইল না।

৩

পরদিন রাজ্যে হুলুস্থুল। ঘরে ঘরে মানুষের হাড়, পথে পথে হাড়ের জাঙ্গাল! রাক্ষসে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, আর রক্ষা নাই। যখন শুনিল, রাজপুত্রদিগেও খাইয়াছে, তখন জীবন্ত মানুষ দলে-দলে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

রাজা বোকা হইয়া রহিলেন, রাজার রাজত্ব রাক্ষসে ছাইয়া গেল।

দলে দলে লোক পলাইল

৪

নদীর ধারে বাঁশের বন হাওয়ায় খেলে, বাতাসে দোলে। এক কৃষাণ সেই বনের বাঁশ কাটিল। বাঁশ চিরিয়া দেখে, দুই বাঁশের মধ্যে বড় বড় গোল দুই ডিম। সাপের ডিম, না কিসের ডিম! কৃষাণ ডিম ফেলিয়া দিল।

অমনি, ডিম ভাঙিয়া, লাল নীল ডিম হইতে লাল নীল রাজপুত্র বাহির হইয়া— মুকুট মাথে খোলা তরোয়াল হাতে জোড়া-রাজপুত্র শনশন করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল!

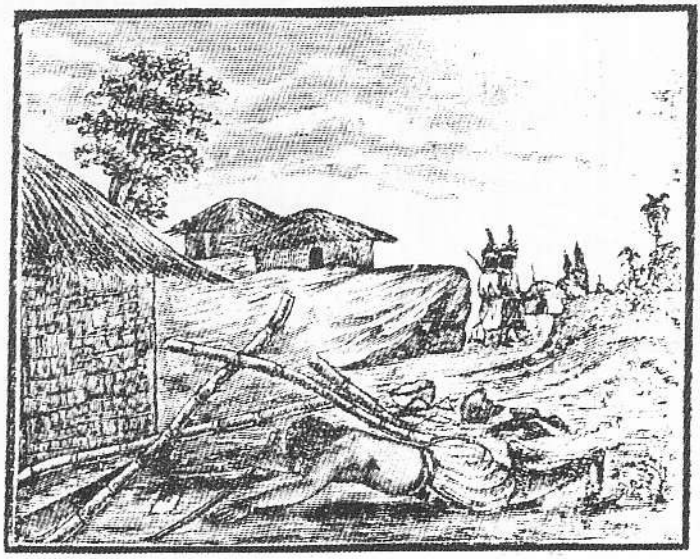

জোড়া রাজপুত্র শন শন করিয়া চলিয়া গেল

ডরে কৃষাণ মূর্ছা গেল।

যখন উঠিল কৃষাণ দেখে, লাল ডিমের খোলস সোনা আর নীল ডিমের খোলস লোহা হইয়া পড়িয়া আছে! তখন লোহা দিয়া কৃষাণ কাস্তে গড়াইল; সোনা দিয়া ছেলের বউর পঁইচে বাজু বানাইয়া দিল।

চলিয়া চলিয়া, জোড়া রাজপুত্র এক রাজার রাজ্যে আসিলেন। সে রাজ্যে বড় খোক্কসের ভয়। রাজা রোজ মন্ত্রী রাখেন, খোক্কসেরা সে মন্ত্রী খাইয়া যায় আর এক ঘর প্রজা খায়। রাজা নিয়ম করিয়াছেন, যে-কোনো জোড়া রাজপুত্র খোক্কস মারিতে পারিবে—জোড়া পরির মতো জোড়া রাজকন্যা আর তাহার রাজত্ব তাহারাই পাইবে। কত জোড়া রাজপুত্র আসিয়া খোক্কসের পেটে গেল। কেহই খোক্কস মারিতে পারে নাই: রাজকন্যাও পায় নাই, রাজ্যও পায় নাই।

লালকমল নীলকমল জোড়া রাজপুত্র রাজার কাছে গিয়া বলিলেন, 'আমরা খোক্কস মারিতে আসিয়াছি।'

রাজার মনে একবার আশা, একবার নিরাশা, শেষে বলিলেন, 'আচ্ছা।'

নীলকমল লালকমল এক কুঠরিতে গিয়া, তরোয়াল খুলিয়া বসিয়া রহিলেন।

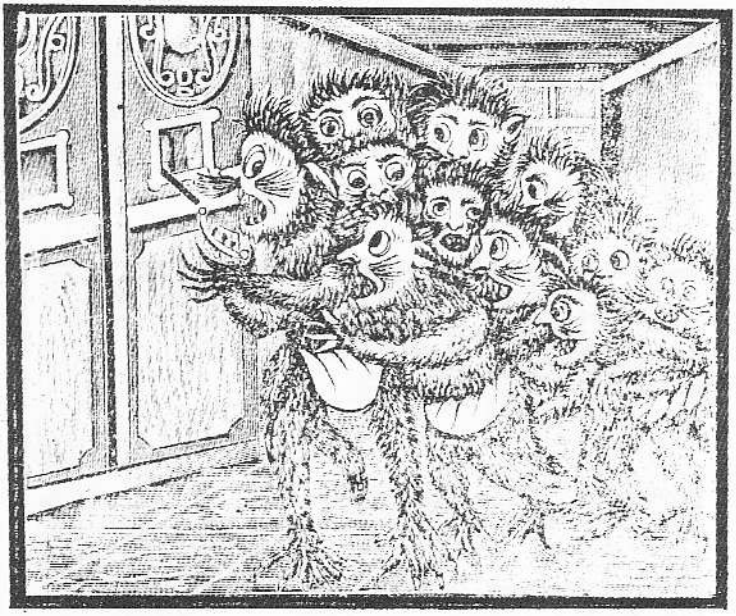

[বাঁপ রেঁ—না জানি সেঁ কিঁ রেঁ!]

৫

রাত্রি ক'দণ্ড, কেহ আসিল না।

রাত্রি আর ক'দণ্ড গেল, কেহ আসিল না।

রাত্রি একপ্রহর হইল, তবু কেহ আসিল না।

শেষে রাত্রি দুপুর হইল; কেহ আর আসে না। দুই ভাইয়ের বড় ঘুম পাইল। নীল লালকে বলিলেন, 'দাদা! আমি ঘুমাই, পরে আমাকে জাগাইয়া তুমি ঘুমাইও।' বলিয়া, বলিলেন, 'খোক্কসে যদি নাম জিজ্ঞাসা করে তো আমার নাম আগে বলিও, তোমার নাম যেন আগে বলিও না।' বলিয়া নীলকমল ঘুমাইয়া পড়িল!

খুব নিশিরাত্রে দুয়ারে ঘা পড়িল। লালকমল তরোয়ালে ভর দিয়া সজাগ হইয়া বসিলেন।

খোক্কসেরা আসিয়াই, আলোতে ভালো দেখিতে পায় না কি–না?—বলিল, 'আঁলো নিবোঁ।'

লালকমল বলিলেন, 'না।'

সকলের বড় খোক্কস রাগে গঁ গঁ, —বলিল, 'বটে! ঘরে কেঁ জাঁগেঁ?' যত খোক্কসে কিচিমিচি—'কেঁ জাঁগে, কেঁ জাঁগেঁ?'

লালকমল উত্তর করিলেন :

'নীলকমলের আগে লালকমল জাগে
আর জাগে তরোয়াল,
দপ দপ করে ঘিয়ের দীপ জাগে—
কার এসেছে কাল?'

খুব জোঁরে টাঁন-নঁ-নঁ

নীলকমলের নাম শুনিয়া খোক্কসেরা ভয়ে তিন হাত পিছাইয়া গেল! নীলকমল আর-জন্মে রাক্ষসী–রানির পেটে হইয়াছিলেন, তাই তাঁর শরীরে কি–না রাক্ষসের রক্ত? খোক্কসেরা তাহা জানিত! সকলে বলিল, 'আচ্ছা নীলকমল কিনা পরীক্ষা কর।'

রাক্ষস–খোক্কসেরা নানারকম ছলনা চাতুরী করে; সকলের বড় খোক্কসটা সে–ই সব আরম্ভ করিল। বলিল, 'তোঁদের নঁখের উঁগাঁ দেখি?'

লাল, নীলের মুকুটটা তরোয়ালের খোঁচা দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। সেটা হাতে করিয়া খোক্কসেরা বলাবলি করিতে লাগিল, 'বাঁপ রে! যাঁর নঁখের উঁগা এঁমন, না জাঁনি সেঁ কী রেঁ!'

তখন আবার বলিল, 'দেখি তোঁদের থুতু কেঁমন?

লালকমল তরোয়ালে প্রদীপের ঘি গরম করিয়া ছিটাইয়া দিলেন। খোক্কসদের লোম পুড়িয়া গন্ধে ঘর ভরিল; খোক্কসেরা গোঁ গোঁ করিয়া ছুটিয়া পলাইল!

খানিক পরে খোক্কসেরা আবার আসিয়া বলিল, 'তোঁদের জিঁভ দেঁখিবঁ।'

লাল, নীলের তরোয়ালখানা দুয়ারের ফাঁক দিয়া বাড়াইয়া দিলেন। বড় খোক্কস দুই হাতে তরোয়াল ধরিয়া, আর সকল খোক্কসকে বলিল, 'এঁইবারঁ জিভ টানিয়া ছিঁড়িবঁ, তোঁরা আঁমাকে ধঁরিয়া খুঁব জোঁরে টাঁন –নঁ–নঁ।'

সকলে মিলিয়া খুব জোরে টানিল, আর তরতর ধার নেঙ্গা তরোয়ালে বড় খোক্কসের দুই হাত কাটিয়া কালো রক্তের বান ছুটিল! চেঁচাইয়া মেচাইয়া, সকল খোক্কস ডিঙাইয়া বড় খোক্কস পলাইয়া গেল!

[গিরগিটির ছা]

অনেকক্ষণ পরে বড় খোক্কস আবার কোথা হইতে আসিয়া বলিল, 'কেঁ জাঁগেঁ, কে জাঁগেঁ?'

কতক্ষণ খোক্কস আসে নাই, লালকমলের ঘুম পাইতেছিল; লালকমল ভুলে বলিয়া ফেলিলেন—

'লালকমল জাগে আর—'

মুখের কথা মুখে—দুয়ার কবাট ভাঙিয়া সকল খোক্কস লালকমলের উপর আসিয়া পড়িল। ঘিয়ের দীপ উল্টিয়া গেল, লালের মাথায় মুকুট পড়িয়া গেল; লাল ডাকিলেন, 'ভাই!'

নীলকমল জাগিয়া দেখেন, খোক্কস! গা-মোড়ামুড়ি দিয়া নীল বলিলেন,

'আরামকাঠি, জিরামকাঠি, কে জাগিস রে?
স্তুদ্যাখ তো দুয়ারে মোর ঘুম ভাঙে কে!'

নীলকমলের সাড়ায় আ-খোক্কস, ছা-খোক্কস সকল খোক্কস আধমরা হইয়া গেল।

নীলকমল উঠিয়া ঘিয়ের দীপ জ্বালিয়া দিয়া সব খোক্কস কাটিয়া ফেলিলেন। সকলের বড় খোক্কসটা নীলকমলের হাতে পড়িয়া, যেন গিরগিটির ছা!

খোক্কস মারিয়া হাতমুখ ধুইয়া দুই ভাইয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে লাগিলেন।

পরদিন রাজা গিয়া দেখেন, দুই রাজপুত্র রক্তজবার ফুল—গলাগলি হইয়া ঘুমাইতেছেন; চারিদিকে মরা খোক্কসের গাদা। দেখিয়া রাজা ধন্যধন্য করিলেন।

রাজার রাজত্ব, জোড়া রাজকন্যা দুই ভাইয়ের হইল।

৬

সেই যে রাক্ষসী-রানি? রাজার পুরিতে থানা দিয়া বসিয়াছে তো? আই-রাক্ষস, কাই-রাক্ষস তার দুই দূত গিয়া খোক্কসের মরণ-কথার খবর দিল। শুনিয়া রাক্ষসী-রানি হাঁড়িমুখ ভারী করিয়া বুকে

তিন চাপড় মারিয়া বলিল, 'আই রে ! কাই রে ! আমি তো আর নাই রে !—'

—ছাই পেটের বিষ-বড়ি
সাত জন্ম পরাণের অরি—
ঝাড়ে বংশ উচ্ছন্ন দিয়া আয় !"

অমনি আই-কাই, দুই সিপাইর মূর্তি ধরিয়া নীলকমল লালকমলের রাজসভায় গিয়া বলিল, 'বুকে খিল, পিঠে খিল, রাক্ষসের মাথার তেল না হইলে তো আমাদের রাজার ব্যারাম সারে না।'

লালকমল নীলকমল কহিলেন, 'আচ্ছা, তেল আনিয়া দিব।'

নতুন তরোয়ালে ধার দিয়া, দুই ভাই রাক্ষসের দেশের উদ্দেশে চলিলেন।

যাইতে যাইতে, দুই ভাই এক বনের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খুব বড় এক অশ্বত্থ গাছ, হয়রান হইয়া দুইভাই অশ্বত্থের তলায় বসিলেন।

সেই অশ্বত্থ গাছে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী পক্ষীর বাসা। বেঙ্গমী বেঙ্গমকে বলিতেছে, 'আহা, এমন দয়াল কারা, দুফোঁটা রক্ত দিয়া আমার বাছাদের চোখ ফুটায় !'

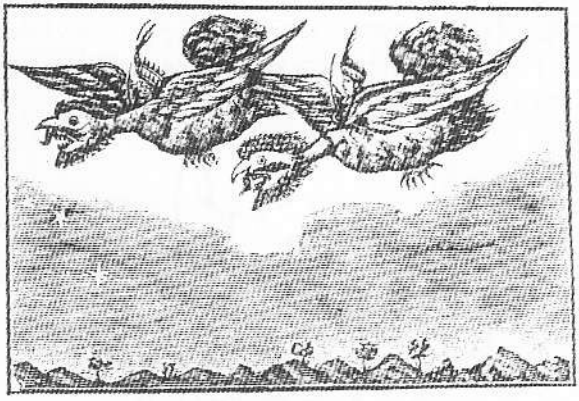

হু হু করিয়া শূন্যে উড়িল

শুনিয়া লাল নীল বলিলেন, 'গাছের উপরে কে কথা কয়? রক্ত আমরা দিতে পারি।'

বেঙ্গমা 'আহা আহা' করিল।
বেঙ্গমী নিচে নামিয়া আসিল।
দুই ভাই আঙুল চিরিয়া রক্ত দিলেন।

রক্ত নিয়া বেঙ্গম বাসায় গেল; একটু পরে শোঁ-শোঁ করিয়া দুই বাচ্চা নামিয়া আসিয়া বলিল, 'কে তোমরা রাজপুত্র আমাদের চোখ ফুটাইয়াছ? আমরা তোমাদের কী কাজ করিব বল?'

নীল লাল বলিলেন, 'আহা, তা তোমরা বেঁচে থাকো; এখন আমাদের কোনোই কাজ নাই।'

বেঙ্গম বাচ্চারা বলিল, 'আচ্ছা, তা তোমরা যাইবে কোথায় চল, আমরা পিঠে করিয়া রাখিয়া আসি।'

দেখিতে দেখিতে ডাঙ্গা-জাঙ্গাল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য সকল ছাড়াইয়া, দুই রাজপুত্র পিঠে, বাচ্চারা হু হু করিয়া শূন্যে উড়িল !

৭

শূন্যে শূন্যে সাত দিন সাত রাত্রি উড়িয়া, আট দিনের দিন বাচ্চারা এক পাহাড়ের উপর নামিল। পাহাড়ের নিচে ময়দান, ময়দান ছাড়াইলেই রাক্ষসের দেশ। নীলকমল গেটাকতক কলাই কুড়াইয়া লালকমলের কোঁচড়ে দিয়া বলিলেন, 'লোহার কলাই চিবাইতে বলিলে এই কলাই চিবাইও।'

নীল লাল আবার চলিতে লাগিলেন।

দুই ভাই ময়দান পার হইয়া আসিয়াছেন— আর—

'হাঁউ মাঁউ! কাঁউ!

মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ!!

ধঁরে ধঁরে খাঁউ!!!'

—করিতে করিতে পালে পালে, অযুতে-নিযুতে রাক্ষস ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। নীলকমল চেঁচাইয়া বলিলেন, 'আয়ী মা! আয়ী মা! আমরাই আসিয়াছি—তোমার নীলকমল, কোলে করিয়া নিয়া যাও!'

'বঁটে বঁটে, থাঁম থাঁম।' বলিয়া রাক্ষসদিগকে থামাইয়া, এ-ই লম্বা লম্বা হাত-পা ছুড়িতে ছুড়িতে, ঝাঁকার জট কাঁপাইতে কাঁপাইতে, হাঁপাইয়া জটবিজটি আয়ীবুড়ি আসিয়া নীলকমলকে কোলে নিয়া—'আমার নীলু! আমার নাঁতু!' বলিয়া আদর করিতে লাগিল। আয়ীর গায়ের গন্ধে নীলুর নাড়ি উলটিয়া আসে। লালকে দেখিয়া আয়ীবুড়ি বলিল, 'ও তোঁর সঙ্গে কেঁ র‍্যা?'

নীলু বলিলেন, 'ও, আমার ভাই লো আয়ীমা ভাই!'
বুড়ি বলিল : **'তাঁ কেঁন মঁনিষ্যি মঁনিষ্যি গন্ধ পাঁই?'**
আঁমার নাঁতু হঁয় তো চিঁবিয়ে খাঁক
নোঁহার কঁলাই।'

—বলিয়া বুড়ি হোৎ করিয়া নাকের ভিতর হইতে পাঁচ গণ্ডা লোহার কলাই বাহির করিয়া লাল-নাতুকে খাইতে দিল।

লাল তো আগেই জানেন—চুপে চুপে লোহার কলাই কোঁচড়ে পুরিয়া, কোঁচড়ের সত্যিকার কলাই কটর কটর করিয়া চিবাইলেন! বুড়ি দেখিল—সত্যি তো, লাল টুকটুক নাতুই তো। বুড়ি তখন গদগদ, দুই নাতু কোলে নিয়া বুলায়, ঢুলায়, কয়—

'আইয়া মাঁইয়া নাঁতুর
লাঁলু নীঁলু কাঁতুর,
নাঁতুর বাঁলাই দূরে যাঁ!'

—কিন্তু লালকমলের শরীরে মনুষ্যের গন্ধ!—কোটর চোখ অসগস, জিভ বারবার খসখস, আয়ীর মুখের সাত কলস লালা গলিল! তা নাতু? তা কি খাওয়া যায়? বুড়ি কুয়োমুখে লাড়ুটুকু খাইতে খাইতে খাইল না। শেষে নাতু নিয়া আয়ী বাড়ি গেল।

৮

সে কী পুরি! রাজ্যজোড়া সেই 'অচিন অভিন' পুরি রাক্ষসে রাক্ষসে কিলবিল। যত রাক্ষসে পৃথিবী ছাঁকিয়া জীবজন্তু মারিয়া আনিয়া পুরি ভরিয়া ফেলিয়াছে। লাল-নীল রাক্ষসের কাঁধে চড়িয়া বেড়ান আর দেখেন—গাদায় গাদায় মরা, গাদায় গাদায় জরা! পচায়, গলায়, পুরি দগদগ থকথক—গন্ধে বারোভূত পলায়, দেব দৈত্য ডরায়! দেখিয়া লাল বলিলেন, 'ভাই, পৃথিবী তো উজাড় হইল।'

নীল চুপ করিয়া রহিলেন, 'নাহ্, পৃথিবী আর থাকে না!' তখন নিশিরাত্রে, যত নিশাচর রাক্ষস, সাতসমুদ্রের ঐ পারে যত রাজরাজ্য উজাড় দিতে গিয়াছে; এক কাচ্চাবাচ্চাও পুরিতে নাই; নীলকমল উঠিয়া, লালকমলকে নিয়া পুরির দক্ষিণ কুয়োর পাড়ে গেলেন। গিয়া নীল বলিলেন, 'দাদা, আমার কাপড়চোপড় ধর।'

কাপড় দিয়া নীলু কুয়োয় নামিয়া এক খড়্গ আর এক সোনার কৌটা তুলিলেন। কৌটা খুলিতেই জীয়নকাঠি-মরণকাঠি দুই ভীমরুল-ভীমরুলী বাহির হইল।

জীয়নকাঠি রাক্ষসের প্রাণ, আর মরণকাঠি যে—সেই রাক্ষসী-রানির প্রাণ। নীল নিলেন জীয়নকাঠি, লাল নিলেন মরণকাঠি।

জীয়নকাঠি-মরণকাঠি—ভীমরুল-ভীমরুলীর গায়ে বাতাস লাগিতেই মাথা কনকন, বুক চনচন, রাক্ষসের মাথায় টনক পড়িল; বোকা রাজার দেশে রাক্ষসী-রানি ঘুমের চোখে ঢুলিয়া পড়িল।

মাথায় টনক, বুকে চমক; দীঘল দীঘল পায়ে রাক্ষসেরা নদী পর্বত এড়ায়, ধাইয়া ধাইয়া আসে! দেখিয়া নীলকমল জীয়নকাঠির পা দুইটি ছিঁড়িয়া দিলেন। যত রাক্ষসের দুই পা খসিয়া পড়িল।

দুই হাতে ভর, তবু রাক্ষস ছুটিয়া আসে—নীলকমল জীয়নকাঠির আর চার পা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। যত রাক্ষসের হাত খসিয়া পড়িল!

হাত নাই, পা নাই, তবু রাক্ষস—

'হাঁউ মাঁউ কাঁউ!
সাঁত শঁত্তুর খাঁউ!!—'

—বলিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া ছোটে। খড়্গের ধারে ধরিয়া নীলকমল জীয়নকাঠির মাথা কাটিলেন। আর যত রাক্ষসের মাথা ছুটিয়া পড়িল। আয়ীবুড়ির মাথাটা ছিটকাইয়া পড়িয়া নীল লালকে ধরে ধরে গিলে-গিলে।

তখন রাক্ষসপুরি খাঁ খাঁ—আর কে থাকে? নীলকমল লালমকল আয়ীবুড়ির মাথা নতুন কাপড়ে জড়াইয়া, মরণকাঠি ভীমরুলের সোনার কৌটা নিয়া 'বেঙ্গম, বেঙ্গম' বলিয়া ডাক দিলেন।

৯

তিন মাস তেরো রাত্রির পর দুই ভাইয়ের পা দেশে পড়িল। দেশের সকলে 'জয় জয়' করিয়া উঠিল!

নীলকমল লালকমল বলিলেন, 'সিপাইরা কই? ওষুধ নাও!'

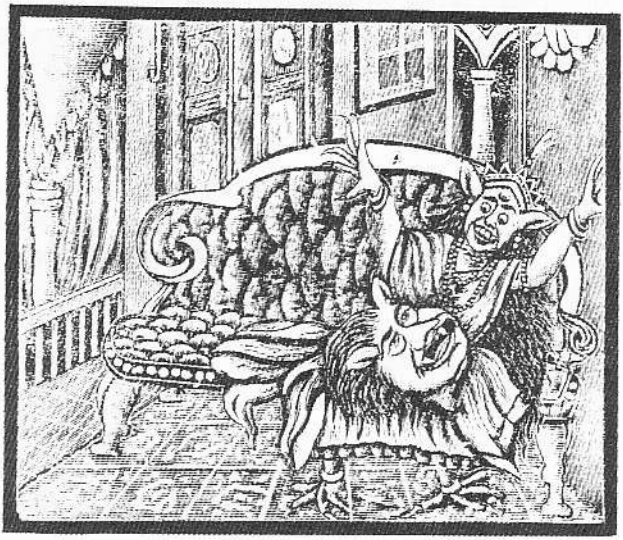

"ও—মা!"

সিপাইরা কি আছে? আই আর কাই তো রাক্ষস ছিল! তারা সেইদিনই মরিয়াছে। নীলকমল লালকমল আপন সিপাই দিয়া বুকে খিল, পিঠে খিল রাজার দেশে রাক্ষসের মাথা পাঠাইয়া দিলেন।

'ও—মা!!' মাথা দেখিয়াই রানি— নিজ মূর্তি ধারণ করিল—

'করম খাম গরম খাম
মুড় মুড়িয়ে হাড্ডি খাম!
হম ধম ধম চিতার আগুন

তবে বুকের জ্বালা যাম ! !'

বলিয়া রাক্ষসী-রানি বিকট মূর্তি ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে নীলকমল লালকমলের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল।

বহির দুয়ারে, 'খাম ! খাম ! !'

লাল বলিলেন, 'থাম থাম'। লালকমল মরণকাঠি ভীমরুল আনিয়া—কৌটা খুলিলেন।

গা ফুলিয়া ঢোল,
চোখের দৃষ্টি ঘোল,

মরণকাঠি দেখিয়া, রাক্ষসী, মরিয়া, পড়িয়া গেল !

সকলে আসিয়া দেখে—এটা আবার কী ! খোক্কসের ঠাকুরমা নাকি ? আমাদের রাজ্যে বুঝি নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল ? সকলে 'হো-হো-হো !!' করিয়া উঠিল।

জল্লাদেরা আসিয়া মরা রাক্ষসীটাকে ফেলিয়া দিল।

১০

রানি মরিল, আর বোকা রাজার রোগ সারিয়া গেল। ভালো হইয়া রাজা রাজ্যে-রাজ্যে ঢোল দিলেন।

প্রজারা আসিয়া বলিল, 'হায় ! আমাদের সোনার রাজপুত্র অজিত-কুসুম কই ?'

রাজা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'হায় ! অজিত-কুসুম কই ?'

এমন সময় রাজপুরির বাহিরে ঢাক-ঢোলের শব্দ। রাজা বলিলেন, 'দেখ তো, কী ?'

গলাগলি দুই রাজপুত্র আসিয়া রাজার পায়ে প্রণাম করিল। রাজা বলিলেন, 'তোরা কি আমার অজিত-কুসুম ?'

প্রজারা সকলে বলিল, 'ইহারাই আমাদের অজিত-কুসুম !'

তখন দুই রাজ্য এক হইল; নীলকমল-লালকমল, ইলাবতী-লীলাবতীকে লইয়া, দুই রাজা সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

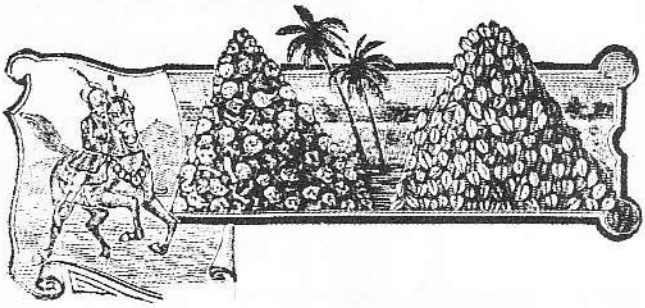

হাড়ের পাহাড় *কড়ির পাহাড়*

ডালিমকুমার

১

এক রাজা, রাজার এক রানি, এক রাজপুত্র। রানির আয়ু একজোড়া পাশার মধ্যে—রাজপুরির তালগাছে এক রাক্ষসী এই কথা জানিত। কিন্তু কিছুতেই রাক্ষসী জো পাইয়া উঠে নাই। একদিন রাজা মৃগয়ায় গিয়াছেন, রাজপুত্র সখা-সাথি পাঁচজন লইয়া পাশা খেলিতেছিলেন; দেখিয়া রাক্ষসী এক ভিখারিনি সাজিয়া রাজপুত্রের কাছে গিয়া পাশাজোড়া চাহিল। রাজপুত্র কি জানেন? হেলায় পাশা-জোড়া ভিখারিনিকে দিয়া ফেলিলেন। তিন ফুঁয়ে রাক্ষসী, রানির আয়ু-পাশা, কোন্ রাজ্যে পাঠাইল কে জানে? রানির ঘরে রানি মূর্ছা গেলেন! রাক্ষসী তাড়াতাড়ি রানিকে খাইয়া রানির মূর্তি ধরিয়া বসিয়া রহিল।

রোজ যেমন, আজও রাজা আসিলেন—রোজ যেমন, আজও রানি সেবাযত্ন করিলেন। কেবল রাজপুত্র দেখিলেন, খাবার দিবার সময়, মায়ের জিভের একফোঁটা জল টস করিয়া পড়িল! গা ছমছম! রাজপুত্র আর খাইলেন না; চুপ করিয়া উঠিয়া গেলেন। এ-কথা আর কেহই জানিল না।

ক-বৎসর যায়, রাজার সাত ছেলে হইল। রাজা খুব ধুমধাম করিলেন। কেবল রাজপুত্র দেখিলেন, তালগাছের আগা দিনদিন শুকায়, তালগাছে কোনো পক্ষী বসে না। রাজপুত্র চুপ করিয়া রহিলেন।

সাত ছেলে বড় হইল। রাজা সময়মতো তাহাদের অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন সব করাইলেন। তখন রাজপুত্রেরা বলিলেন, 'এখন আমরা দেশভ্রমণে যাইবে।'

রাজা বলিলেন, 'বড়কুমার গেল না, তোরা কী করিয়া যাইবি?' রাজা বড়কুমারকে খবর দিলেন।

খবর পাইয়াই এক পক্ষিরাজে চড়িয়া বড়কুমার ভাইদের কাছে গেলেন, 'কেন রে ভাই! দাদাকে তোরা ভুলিয়া গিয়াছিলি? চল্, এইবার দেশভ্রমণে যাইব।' আট ভাই সাজসজ্জা করিয়া চরকটক সঙ্গে রাজপুরি হইতে বাহির হইলেন।

ছাদের উপরে রাক্ষসী রানি দেখে— বড় বিপদ, কুমার তো গেল! আছাড়ি-বিছাড়ি ঘরে গিয়া এক কৌটা খুলিল; কৌটার মধ্যে সূতাশঙ্খ সাপ। রাক্ষসী বলিল :

'সূতাশঙ্খ, সূতাশঙ্খ শাঁখের আওয়াজ!
কুমারের আয়ু কিসে বল্ দেখি আজ?'

সূতাশঙ্খ সূতার মতো ছোট্ট সরু; কিন্তু আওয়াজ তার শঙ্খের মতো। সরু ফণা তুলিয়া শঙ্খের আওয়াজে সুতাশঙ্খ বলিল :

'তোর আয়ু কিসে রানি, মোর আয়ু কিসে?
ডালিম কুমারের আয়ু ডালিমের বীজে।'

রাক্ষসী বলিল :

'যাও ওরে সূতাশঙ্খ, বাতাসে করি ভর,
যম-যমুনার রাজ্য-শেষে পাশাবতীর ঘর!
এই লিখন দিও নিয়া পাশাবতীর ঠাঁই,
সাত ছেলের তরে আমার সাত কন্যা চাই।
রিপু অরি যায়, সূতা, চিবিয়ে খাবে তারে,
সতিনের পুত যেন পাশা আনতে নারে।'

লিখন নিয়া, সূতাশঙ্খ, বাতাসে ভর দিয়া গাছের উপর দিয়া-দিয়া চলিল! রাক্ষসী এক ডালিম হাতে, আবার মন্ত্র পড়িল :

'পক্ষিরাজ, পক্ষিরাজ, উড়ে চলে যা,
পাশাবতীর রাজ্যে গিয়া ঘাস জল খা।'

মন্ত্র পড়িয়া রাক্ষসী তাড়াতাড়ি আসিয়া রাজপুরির হাজার সিঁড়ির ধাপে উঠিয়া বলিল, 'সিঁড়ি তুমি কার?'

সিঁড়ি বলিল, 'যে যখন যায়, তার।'

রাক্ষসী বলিল, 'তবে সিঁড়ি দু ফাঁক হও, এই ডালিমের বীজ তোমার ফাটলে থাক্।'

ডালিমের বীজ হাজার সিঁড়ির ধাপের নিচে জন্মের মতো বন্ধ হইয়া রহিল; রাক্ষসী গিয়া নিশ্চিন্তে দুধ-ধবধব শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

অমনি—আট রাজপুত্র কোন্ বনের মধ্যে পড়িয়া ছিলেন, সেইখানে খটাস করিয়া বড়কুমারের চোখ অন্ধ হইয়া গেল। বড়কুমার চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ভাই রে! বিছার কামড়—গেলাম গেলাম!!'

সূর্য ডুবিয়া গেল, চারিদিকে ঝড়-বৃষ্টি, অন্ধকার—বনের মধ্যে কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না; বড় রাজকুমার কোথায় পড়িয়া রহিলেন, চরকটক কোথায় গেল—সাত রাজপুত্রের ঘোড়া ঝড়ের আগে ছুটিয়া চলিল।

২

রাক্ষসী তো স্বপ্ন দেখে—সূতাশঙ্খ এতক্ষণে যম-যমুনা দেশের 'সে পার'! ওদিকে সূতাশঙ্খ সারাদিন গাছে গাছে চলিয়া, হয়রান; একখানে রাত্রি হইল, কে আর যায়? পরিপাটি রাজার বাগান—বাগানের এক গাছের ফলের মধ্যে ঢুকিয়া, বেশ করিয়া কুণ্ডলী মণ্ডলী পাকাইয়া, সূতা ঘুমাইয়া রহিল।

রাজকন্যা রোজ সেই গাছের ফল খান। মালী নিত্যকার মতো ফল আনিয়া দিল; রাজকন্যা নিত্যকার মতো ফলটি খাইলেন। ফলের সঙ্গে সূতাশঙ্খ, রাক্ষসীর লিখন, রাজকন্যার পেটে গেল।

লিখন-টিখন ওসব কথা রাজপুত্রেরা কি জানে? উড়িয়া, ছুটিয়া, পক্ষিরাজেরা যে কোথা দিয়া কী করিয়া গেল, কেহই জানে না। একখানে গিয়া ভোর হইল; সকলে দেখেন— দাদা নাই! ভাবিলেন পাছে পড়িয়া গিয়াছেন! রাশ আলগা দিয়া সাত ভাই দাদার জন্য পক্ষিরাজ থামাইলেন।

নাহ্— দিন যায়, রাত যায়, দাদার দেখা নাই! তখন এক ভাই বলিলেন, 'ঘোড়া যদি আগে দিয়া থাকে!'

'ঠিক, ঠিক!!' সকলে পক্ষিরাজ সামনে ছুটাইয়া দিলেন।

মন্ত্র-পড়া পক্ষিরাজ একেবারে পাশাবতীর পুরে গিয়া উপস্থিত! পাশাবতীর পুরে পাশাবতী দুয়ারে নিশান উড়াইয়া ঘর-কুঠরি সাজাইয়া, সাজিয়া বসিয়া আছে। যে আসিয়া পাশা খেলিয়া হারাইতে পারিবে, আপনি, আপনার ছয় বোন নিয়া তাহাকে বরণ করিবে। রাজপুত্রদিগকে দেখিয়া পাশাবতী বলিল, 'কে তোমরা?'

রাজপুত্রেরা বলিলেন, 'অমুক দেশের রাজপুত্র, দেশভ্রমণে আসিয়াছি।'

পাশাবতী বলিল, 'না! দেখিয়া বোধহয় যক্ষ রক্ষ! তোমরা আমার পণ জানো?'

'জানি না।'

'আমার পাশার পণ! দানব যক্ষ রক্ষ হইলে পরখ দেখিয়া নিব; মানুষ হইলে খেলিতে হইবে।

যে দিনে সে মালা পায়,
হারিলে মোদের পেটে যায়।'

রাজপুত্রেরা বলিলেন, 'পরখ কর!'

পাশাবতী লিখন দেখিতে চাহিল, 'দানব যক্ষ রক্ষ হইলে লিখন থাকিবে।'

রাজপুত্রেরা বলিলেন, 'লিখন কিসের? লিখন নাই।'

'তবে খেল।'

খেলিয়া রাজপুত্রেরা হারিয়া গেলেন। পাশাবতীর সাত বোনে সাত রাজপুত্র, পক্ষিরাজ সব কুঁচিকুঁচি করিয়া কাটিয়া হালুম হালুম করিয়া খাইয়া ফেলিল। ফেলিয়া, আবার রূপসী মূর্তি ধরিয়া বসিয়া রহিল। রাক্ষসী-রানি স্বপ্ন দেখে কী, আর তার কপালে হইল কী! রাক্ষসীর মাথায় টনক পড়িয়াছে কি না, কে জানে? যাক!

৩

অন্ধ রাজকুমারকে পিঠে করিয়া পক্ষিরাজ ঝড়-বৃষ্টি অন্ধকারে শূন্যের উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে— হাতের রাশ হারাইয়া রাজকুমার কখন কোথায় পড়িয়া গেলেন। পক্ষিরাজ এক পাহাড়ের উপর পড়িয়া পাথর হইয়া রহিল।

রাজকুমার যেখানে পড়িলেন, সে এক নগর! সেই নগরে রাজপুরিতে সন্ধ্যার পর লক্ষ কাড়া, লক্ষ সানাই, ঢাক-ঢোল সব বাজিয়া উঠে; ঘরে ঘরে, চূড়ায় চূড়ায়, পথে পথে মশাল জ্বলে; নিশান উড়ে; হৈ হৈ আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়।

ভোরে সব চুপ! তারপর কেবল কান্নাকাটি, চিৎকার-হাহাকার, বুকে চাপড়, ছুটাছুটি—চোখের জলে দেশ ভাসে, শোকে রাজ্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

আবার দুপুর বহিয়া গেলে, যখন রাজার হাতি সাজিয়া গুজিয়া বাহির হয়, তখন রাজ্যের লোক নিশ্বাস ছাড়িয়া গিয়া খাওয়াদাওয়া করে—তারপর সমস্ত নগরের লোক পথে পথে সারি দিয়া দাঁড়ায়।

পাটহাতি ছোটে, ছোটে—একজনকে ধরিয়া, সিংহাসনে তুলিয়া নেয়—অমনি ঢাক-ঢোল

বাজাইয়া, শাঁখে ফুঁ দিয়া সিপাই, সান্ত্রী, মন্ত্রী, অমাত্য সকলে তুলিয়া-নেওয়া মানুষকে লইয়া গিয়া রাজ্যের রাজা করে। রাজকন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। আবার আনন্দের হাট বসে।

পরদিন দেখা যায় রাজকন্যার ঘরে কেবল হাড়গোড়; রাজার চিহ্নও নাই! এই রকমে কত রাজা হইল, কত রাজা গেল। কিন্তু রাজা না থাকিলে রাজ্য থাকে না; তাই নিত্যনতুন রাজা চাই! রাজকন্যা জানেন না, কেহই বুঝিতে পারে না, রাজাকে কিসে খায়!

পাটহাতি ছুটিয়াছে। নগরে 'সার সার' শোর পড়িয়া গিয়াছে; সকলে চিৎকার করিতেছে—'পথ ছাড়, পথ ছাড়, কাতার দাও।'

রাজকুমারের জ্ঞান হইয়াছে, শব্দ শুনিয়া রাজকুমার উঠিয়া বসিলেন—কিসের পথ, কোথায় আসিয়াছেন, রাজপুত্র কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; রাজপুত্র থতমত খাইয়া রহিলেন।

হাতি কাতারে কাহাকেও ছুঁইল না—হু হু করিয়া সকল পথই ছাড়াইয়া আসিয়া রাজপুত্রকে তুলিয়া সিংহাসনে বসাইল। রাজ্যের লোক 'রাজা! রাজা!' বলিয়া জয়-জয়কার দিয়া অন্ধ রাজকুমারকে নিয়া রাজা করিল।

ধুমধাম, অভিষেক, জাঁকজমক, বিচার-আচার, সভা-দরবার—সবশেষে রাত্রি—রাজার দেশে সব ঘুমাইয়াছে। নগরে শহরে সাড়াটি নাই, দুয়ার দরজায় পাহারা নাই—থাকিয়া কী হইবে? কাল যা হইবে সকলেই তো তা জানে, পাহারারা আর পাহারা দেয় না! রাজকন্যা ঘুমে বিভোর!

সেই কালরাত্রে কেবল রাজকুমার জাগিয়া আছেন। ঘর-বার নিঝুম, পৃথিবী-সংসারে টুঁ শব্দ নাই—পোকামাকড়, পক্ষীটিও ডাকে না—কালনিশির কালঘুমে সব যেন ছাইয়া আছে।

ঘরে প্রদীপ দপদপ, রাজপুত্রের মন ছবছব; কোনোই সাড়া নাই—কোনোই শব্দ নাই।

হঠাৎ ঘুমের রাজকন্যা চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইলেন; চিড়িক দিয়া ঘরে বিজলি জ্বলিয়া উঠিল, চড়চড় করিয়া দেওয়ালের গা ফাটিয়া গেল; চুর চুর, ঝুর ঝুর চারিদিকে ঝালর-পাত খসিয়া পড়িতে লাগিল। রাজপুত্রের সকল গা কাঁটা—শক্ত করিয়া তরোয়ালের মুঠি ধরিয়া হাঁটু গাড়িয়া রাজকুমার বলিলেন, 'কে?'

রাজপুত্র কিছুই দেখিতে পান না; ঘরের আলো, বিদ্যুতের চমক—রাজকন্যার শরীর কাঠের মতো শক্ত—রাজকন্যার নাকের ভিতর হইতে সরু মিহি—চুলের মতো সাপ বাহির হইল! সেই চুল দেখিতে দেখিতে সূতা—দড়া—কাছি, তারপর প্রকাণ্ড অজগর! শঙ্খের মতো আওয়াজে সেই অজগর গর্জিয়া উঠিল।

পুরি থরথর কাঁপে! হাতের তরোয়াল ঝনঝন— রাজপুত্র হাঁকিলেন, 'জানি না, যে হও তুমি, রক্ষ যক্ষ দানব! যদি রাজপুত্র হই, যদি নিষ্পাপ শরীর হয়, দৃষ্টির আড়ালে তরোয়াল ঘুরাইলাম, এই তরোয়াল তোমাকে ছুঁইবে!"

বলা আর কহা—সূতাশঙ্খ বত্রিশ ফণা ছড়াইয়া বিষদাঁতে আগুন ছুটাইয়া লকলক করিয়া উঠিয়াছে, রাজপুত্রের তরোয়াল ঝ-ঝন-ঝন শব্দে ঘরের ঝাড়বাতি চূর্ণ করিয়া সূতাশঙ্খ-এর বত্রিশ ফণায় গিয়া লাগিল! অমনি রাজপুত্র দেখেন—সাপ! ঘরময় বিদ্যুতের ধাঁধা, চারিদিকে ধোঁয়া! রাজপুত্র শনশন তরোয়াল ঘুরাইয়া বলিলেন, 'চক্ষু পাইলাম!'

তরোয়ালে অজগর সাত খণ্ড হইয়া কাটিয়া গেল; সেই নিশিতে রাক্ষসী-রানির পুরিতে ধ-ধ্বড়-ধ্বড় শব্দে হাজার সিঁড়ির ধাপ ধসিয়া গেল, রাজকুমারের আয়ু সহস্রডাল সোনার ডালিম গাছ হইয়া গজাইয়া উঠিল। রাজপুরিতে ভূমিকম্প—গুড় গুড় দুড় দুড় শব্দ! ভয়ে রাক্ষসী ইঁদুর হইয়া

'চি চি' করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। রানির শরীর আবার মূর্ছা গিয়া পড়িয়া রহিল। রাজ্যে রাজপুরিতে হাহাকার— 'এসব কী !'

সাত রাজার রাজ্যের লোক নিত্যকার মতো কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছে—দেখে, ধন্য ! ধন্য ! — রাজা। রাজা আজ জীয়ন্ত ! ! লোকের আনন্দ ধরে না ! দেখে হাজারো ফণা সাত কুঁচি সাপ—মেঝেতে পড়িয়া ! ! কী সর্বনাশ ! সকলে বুঝিল, এই সাপে এতদিন এত রাজা খাইয়াছে।—'সাপকে পোড়াও।'

পোড়াইতে গিয়া, সাপের পেটে লিখন ! লিখন রাজার কাছে আসিল। পড়িয়া রাজপুত্র বলিলেন, 'রাজকন্যা ! আর তো আমি থাকিতে পারি না—আমার সাত ভাই বুঝি রাক্ষসের পেটে গিয়াছে ! আমি চলিলাম !' রাজ্যের লোক মনঃক্ষুণ্ন— 'শেষে এক রাজা পাইলাম তিনিও কোথায় চলিলেন।' রাজা কবে ফিরিবেন —সকলে পথ চাহিয়া রহিল।

ডালিমকুমার যাইতেছেন, যাইতেছেন, এক পাহাড়ে উঠিয়া দেখেন পক্ষিরাজ ! ছুঁইতেই আবার প্রাণ পাইয়া পক্ষিরাজ, 'চিঁহি হিঁ !' করিয়া উঠিল। রাজপুত্র বলিলেন—'পক্ষিরাজ, এইবার চল।'

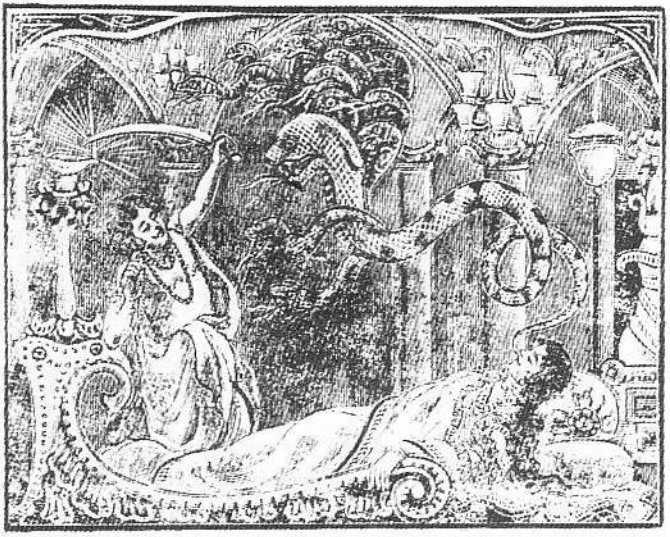

যক্ষ হও রক্ষ হও তরোয়াল তোমাকে ছুঁইবে!

যম-যমুনার দেশ—অন্ধকার গায়ে ঠেকে, বাতাসে পাথর উড়ে, রাজপুত্র কিছুই মানিলেন না।— 'ঝড়ের গতি কোন্ ছার, পক্ষিরাজে আসন যার।' তীর-বজ্রের মতো পক্ষিরাজ ছুটিয়া চলিল। কতক দূরে গিয়া কড়ির পাহাড়। কড়ির পাহাড়ে পক্ষিরাজের পা চলে না; ছটফট রটারট শব্দ। রাজপুত্র বলিলেন, 'পক্ষী ! থামিও না; ছুটে চল।' পক্ষিরাজ তীর-বজ্রের গতি—সারারাত্রি পায়ের নিচে কড়ির পাহাড় চুর হইয়া গেল।

তারপরেই হাড়ের পাহাড়। হাড়ের পাহাড়ের নিচে কলকল শব্দে রক্ত-নদীর জল তোড়ে ছুটিয়াছে; রক্তের তরঙ্গ, রক্তের ঢেউ ! দাঁত বাহির করিয়া মড়ার মুণ্ড 'হি ! হি !' করিয়া উঠে, হাড়ে

হাড়ে কটাকট, খটাখট শব্দ— কান পাতা যায় না। রাজপুত্র বলিলেন, 'পক্ষী ! ভয় নাই, চোখ বুজিয়া চল।' পায়ের নিচে হাড়ের পাহাড় খট-খট-খটাং, ছর-র-র—ছটফট শব্দে তুষ হইয়া গেল ! তখন রাত্রি পোহাইল, রাজপুত্র দেখেন—দূরে পাশাবতীর পুর। পাশাবতীর পুরে ফটকে নিশান; নিশানে লেখা আছে—

'পাশা খেলিয়া যে হারাইবে, সাত বোনে মালা দিব !'
রাজপুত্র হাঁকিলেন, 'পাশা খেলিব !'

ইঁদুর আসে-আসে—পালায়

খেলিতে বসিয়া রাজপুত্র চমকিয়া গেলেন—এ পাশা তো তাঁর-ই। খেলিতে গিয়া রাজপুত্র হারিয়া গেলেন— দেখেন, এক ইঁদুর পাশা উল্টাইয়া দেয়। আনমন রাজপুত্র বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাশাবতী বলিল, 'রাজপুত্র ! পণ ফেল।'

'পক্ষিরাজ নাও; কাল আবার খেলিব।' বলিয়া রাজপুত্র উঠিয়া গেলেন। পাশাবতীরা তখনি পক্ষিরাজকে গরাসে গরাসে খাইয়া ফেলিল।

পরদিন এক গ্রামের মধ্যে গিয়া রাজপুত্র এক বিড়ালের ছানা নিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'এস, আজ খেলিব।'

খেলিতে বসিয়াছেন—আজ ইঁদুর আসে আসে করে, আসে না —কী যেন দেখিয়া পলায়।

রাজপুত্র দান ফেলিলেন—

'এই হাতে ছিলে পাশা, পুনু এলে হাতে—
এত দিন ছিলে পাশা কার দুধ-ভাতে ?'

আর দান পড়ে। পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে পাশাবতী হারিয়া গেল। রাজপুত্র বলিলেন, 'আমার পক্ষিরাজ দাও।'

রাক্ষসী পক্ষিরাজ দিল।

আবার খেলা। রাক্ষসী হারিল; রাজপুত্র বলিলেন, 'আমার ঘোড়ার মতো ঘোড়া, আমার মতো রাজপুত্র দাও।' পাশাবতী এক রাজপুত্র, এক ঘোড়া আনিয়া দিল। রাজপুত্র দেখেন, ভাই; ভাইয়ের ঘোড়া! রাজপুত্র আবার খেলিলেন। খেলিতে খেলিতে রাজপুত্র—সাত ভাই, সাত ভাইয়ের ঘোড়া, পাশাবতীর রাজ-রাজত্ব ঘর পুরি সব জিতিলেন। শেষে বলিলেন, 'এখন কী দেবে? এই পাশা আর ইঁদুর দাও।'

পাশাবতী কি পাশা অমনি দেয়? তখন রাজপুত্র বিড়ালের ছানা ছাড়িয়া দিলেন—বিড়াল গড়গড় করিয়া ইঁদুরকে ধরিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিল। ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল—রাজ-রাজত্ব কোথায় সব? হাতের পাশা হাতে, রাজপুত্র দেখেন সাত পাশাবতী সাত কেঁচো হইয়া মরিয়া রহিয়াছে!

পাশা বলিল, 'কুমার, কুমার, ঘরে চল।'

আট রাজপুত্র, আট পক্ষিরাজ হু হু করিয়া ছুটাইয়া দিলেন।

রাজপুরীতে রানি উঠিয়া বসিয়াছেন—'কতকাল ঘুমাইয়াছি! আমার কুমার কই?'

কুমার কই?—চারিদিকে জয়ঢাক বাজে, পথের ধূলায় অন্ধকার—আট রাজপুত্র আট পক্ষিরাজের সারি দিয়া রাজ্যে ফিরিয়াছেন। কুমার আসিয়া বলিলেন, 'মা কই, মা কই?'—আট রাজপুত্র রানিকে ঘিরিয়া প্রণাম করিলেন। শূন্য পুরিতে আবার সোনার হাট মিলিল।

'ভাইদের খোঁজে কবে গিয়েছেন, সবে-জীয়ন্ত এক রাজা আমাদের, আজও ফিরেন না।' খুঁজিয়া খুঁজিয়া সাত রাজার দেশের যত লোক আসিয়া দেখিল—'আমাদের রাজা এইখানে!' তখন রাজকন্যা রাজপাট তুলিয়া সেইখানে নিয়া আসিলেন।

সকল দেখিয়া রাজা অবাক!

পরদিন ভোরবেলা সোনার ডালিমগাছে হাজার ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে—আর দুপুরবেলা রাজপুরির তালগাছটা, কিছুর মধ্যে কিছু না, শিকড় ছিঁড়িয়া দুম করিয়া পড়িয়া, ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল।

সাপের পরশ হিম

মণিমালা

পাতাল-কন্যা মণিমালা

১

এক রাজপুত্র আর এক মন্ত্রিপুত্র—দুই বন্ধুতে দেশভ্রমণে গিয়াছেন। যাইতে, যাইতে এক পাহাড়ের কাছে গিয়া... সন্ধ্যা হইল!

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, 'বন্ধু, পাহাড়-মুল্লুকে বড় বিপদ-আপদ; আইস, ঐ গাছের ডালে উঠিয়া কোনোরকমে রাতটা কাটাইয়া দিই।'

রাজপুত্র বলিলেন,— 'সেই ভালো।'

দুইজনে ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া, এক সরোবরের পাড়ে খুব উঁচু গাছের আগডালে উঠিয়া শুইয়া রহিলেন।

অনেক রাত্রে রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কী-জানি কিসের এক ভয়ংকর শব্দ শুনিয়া জাগিয়া দেখেন—বনময় আলো! সেই আলোতে—ওরে বাপরে বাপ! রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রের গা-অঙ্গ ডোল হইল, গায়ে-পায়ে কাঁটা দিল, দেখেন—আকাশ-পাতালে গলা ঠেকাইয়া এক কালো অজগর তাঁহাদের ঘোড়া দুইটাকে আস্ত গিলিয়া খাইতেছে! অজগরের মুখে ঘোড়া ছটফট করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে ঘোড়া দুইটাকে গিলিয়া, যতদূর আলোকে দেখা যায়, অজগর, বনের পোকামাকড় খাইতে খাইতে ততদূর বেড়াইতে লাগিল।

রাজপুত্র থরথর কাঁপেন! মন্ত্রিপুত্র চুপি চুপি বলিলেন, 'বন্ধু। ডরাইও না, ওই যে আলো, ওটা সাত-রাজার ধন ফণীর মণি— মণিটি নিতে হইবে।'

রাজপুত্র বলিলেন, 'সর্বনাশ! কেমন করিয়া নিবে?'

'ভয় নাই, দেখ, আমি মণি আনিব।'

বলিয়া মন্ত্রিপুত্র, আস্তে আস্তে নামিয়া আসিয়াই এক খাবল কাদা আনিয়া মণির উপর ফেলিয়া দিলেন। দিয়াই আপনার তরোয়ালখানি কাদার উপর উল্টাইয়া রাখিয়া, সরসর করিয়া গাছে উঠিয়া গেলেন! সব অন্ধকার—দুইজনে চুপ!

অজগর, তার মণি!—সেই মণির আলো নিভিয়াছে; অজগর, হোঁস হোঁস শোঁস শোঁস শব্দে ছুটিয়া আসিল; দেখে, মণি নাই! অজগর তরোয়ালের উপর ফটাফট ছোবল মারিতে লাগিল।

কাদার তলে মণি নিখোঁজ—তলোয়ারের ধারে অজগরের ফণায় রক্তের বান। চোখে আগুনের হলক, মুখে বিষের ঝলক, অজগর পাগল হইয়া গেল।

কাল্-অজগর পাগল হইয়াছে—সারা বনের গাছ মুড়মুড় করিয়া ভাঙে, লেজের বাড়িতে সরোবরের জল শতখান হইয়া যায়। অবশেষে রাগে, দুঃখে অজগর, নিজের শরীর নিজে কামড়াইয়া তরোয়ালে মাথা খুঁড়িয়া মরিয়া গেল।

থরথর করিয়া দুই বন্ধুর রাত পোহাইল। পরদিন রোদ উঠিলে, দুইজনে বেশ করিয়া দেখিলেন যে, না—অজগর সত্যিই মরিয়াছে। তখন নামিয়া কাদামাখা মণি কুড়াইয়া দুই বন্ধু সরোবরে নামিলেন।

২

নামিতে, নামিতে দুই বন্ধু যতদূর যান— জল কেবল দুই ভাগ হইয়া শুকাইয়া যায়! শেষে, মণির আলোতে দেখেন, পাতালপুরি পর্যন্ত এক পথ! দুইজনে চলিতে লাগিলেন।

খানিক দূর যাইতেই এক পরম সুন্দর অট্টালিকা। চারিদিকে ফুলবাগান—ফুলে ফুলে ছড়াছড়ি, লতায় লতায়, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি। দুই বন্ধু অট্টালিকার মধ্যে গেলেন।

অট্টালিকার মধ্যে শোঁ শোঁ, রোঁ রোঁ শব্দ। রাজপুত্র ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, 'বন্ধু, ডরাইও না, মণি কাছে থাকিতে ভয় নাই।'

লকলকে, চকচকে কোটি রঙের কোটি সাপ ডিঙাইয়া, সাপের উপর দিয়া হাঁটিয়া দুইজনে এক ঘরে গেলেন! সেখানে সাপের দেওয়াল, সাপের থাম, সাপের মেঝে, সাপের কড়ি, সাপের মণির দেওয়ালগিরি—লক্ষ সাপের শয্যায় মণিমালা রাজকন্যা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন।

রাজপুত্র বলিলেন, 'বন্ধু, এ কী!'

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, 'বন্ধু, দেখ, পাতালপুরির পাতালকন্যা।'

আশ্চর্য হইয়া—রাজপুত্র দেখিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে মন্ত্রিপুত্র মণিটি নিয়া মণিমালার কপালে ছোঁয়াইতেই মণিমালা জাগিয়া উঠিয়া বসিলেন। রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া ত্রস্তে-ব্যস্তে মণিমালা বলিলেন, 'আপনারা কে? এ যে কাল্-অজগরের পুরি, আপনারা কেমন করিয়া এখানে আসিলেন।'

মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, 'রাজকন্যা, ভয় নাই; কাল্-অজগরকে আমরা মারিয়া ফেলিয়াছি। এই রাজপুত্র তোমার বর।'

রাজপুত্র-মণিমালা দুইজনে, মাথা নিচু করিলেন।

হাসিয়া মন্ত্রিপুত্র মণিমালার গলার মালা রাজপুত্রের গলায় দিলেন, রাজপুত্রের গলার মালা মণিমালার গলায় দিলেন।

চারিদিকে লক্ষ সাপের ফণা হেলিয়া দুলিয়া উঠিল।

৩

সাপের পুরিতে পরম সুখে দিন যায়। কতক দিন পর, মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, 'বন্ধু, আমরা তো এখানে সুখেই আছি, দেশে কী হইল কে জানে! আমি যাই, পঞ্চকটক দোলা-বাদ্য সকলে নিয়া আসিয়া তোমাদিগকে বরণ করিয়া দেশে লইয়া যাইব।'

রাজপুত্র বলিলেন, 'আচ্ছা।'

আবার সরোবরের পথে মণি দেখা দিল। মন্ত্রিপুত্র দেশে গেলেন। বন্ধুকে বিদায় দিয়া, মণি লইয়া রাজপুত্র ফিরিয়া আসিলেন।

দুজনে আছেন। রাজপুত্র পৃথিবীর কত কথা মণিমালাকে বলেন, মণিমালা পাতালের যত কথা রাজপুত্রের কাছে বলেন। বলিতে বলিতে, একদিন মণিমালা বলিলেন, 'জন্মে কখনো পৃথিবী দেখিলাম না, দেখিতে বড় সাধ যায়।'

রাজপুত্র কিছু বলিলেন না।

দুপুরে রাজপুত্র শুইয়া আছেন। রাজপুত্রকে দেখিয়া মণিমালা ক্ষার-খৈল, গামছা নিয়া মণিটা হাতে সরোবরের পথে পৃথিবীতে উঠিলেন—'আহা! কী সুন্দর!'

পৃথিবী দেখিয়া মণিমালা অবাক। মণিমালা বলিলেন, 'মণি, মণি! উজলে ওঠ, এই সরোবরের জলে আমি নাইব।'

অমনি মণির আলো উজলে উঠিল, সরোবরের মাঝখানে রাজহাঁসের থাক, শ্বেতপাথরের ধাপ, ধবধবে সুন্দর ঘাটলা হইল। মণিমালা ধাপের উপর মণি রাখিয়া ক্ষার-খৈল দিয়া গা-পা কচলাইতে লাগিলেন।

সেই সময় সেই দেশের রাজপুত্র সেই বনে শিকার করিতে আসিয়াছেন। তিনি সব দেখিলেন। দেখিয়াই রাজপুত্র ছুটিয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

চমকিয়া মণিমালা দেখেন— মানুষ! মণি লইয়া মণিমালা ডুব দিলেন। চক্ষের পলকে সব কোথায় গেল! রাজপুত্র 'হায় হায়' করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন।

কাঠকুড়ানি পেঁচোর মা এক বুড়ি এই সব দেখিল। দেখিয়া বুড়ি চুপটি করিয়া রহিল।

৪

শিকারে গিয়া রাজপুত্র পাগল হইয়া আসিয়াছেন; কত ওষুধ-বিষুধ, কিছুতেই রোগ সারে না; রাজা রানি অধীর, রাজ্যের লোক অস্থির। অবশেষে রাজা ঢেঁটরা দিলেন— 'রাজপুত্রকে যে ভালো করিতে পারিবে, অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা তাকে দিব।' কে ঢেঁটরা ছুঁইবে? কেহই ছুঁইল না। শেষে পেঁচোর মা বুড়ি এই কথা শুনিল। শুনিয়া বুড়ি উঠি কি পড়ে আছাড়ি-বিছাড়ি সাত তাড়াতাড়ি আসিয়া ঢেঁটরা ধরিল।

রাজার কাছে গিয়া বুড়ি বলিল, 'তা রাজামশাই, আমি তো ওষুধ জানি—তা আমি বুড়ো হাবড়া মেয়েমানুষ, তা আমার পেঁচোর সঙ্গে যদি রাজকন্যার বিয়ে দাও, তো রাজপুত্রকে ওষুধ দি।'

রাজা তাহাই স্বীকার করিলেন।

তখন পেঁচোর মা বুড়ি একরাশ তুলা, এক চরকা নিয়া, পবনের নায়ে উঠিয়া বলিল :

'ঘ্যাঁঘর চরকা ঘ্যাঁঘর,
রাজপুত্র পাগল!
হটর হটর পবনের না'
মণিমালার দেশে যা।'

পবনের নাও মণিমালার দেশে গেল। বুড়ি সরোবরের কিনারে বসিয়া ঘ্যাঁঘর ঘ্যাঁঘর করিয়া চরকায় সূতা কাটিতে লাগিল।

আবার দুপুরে রাজপুত্র শুইয়াছিলেন; মণিমালা মণি নিয়া উঠিয়া আসিলেন—'ও বুড়ি, তুই কোথা থেকে এলি? আমাকে একখানা শাড়ি বুনিয়া দে।'

বুড়ি শাড়ি বুনিয়া দিয়া কড়ি চাহিল! মণিমালা বলিলেন, 'বুড়ি, কড়ি তো নাই, এই এক মণি আছে!' বুড়ি বলিল, 'তা, তা—তাই দাও।' মণিমালা মণি দিতে গেলেন, বুড়ি খপ্ করিয়া মণিমালাকে পবনের নৌকায় উঠাইয়া বলিল :

'ঘ্যাঁঘর চরকা ঘ্যাঁঘর,
রাজপুত্র পাগল!
হটর হটর পবনের না'
রাজপুত্রের কাছে যা।'

আর কী? বুড়ি মণিমালাকে রাজপুরিতে দিয়া, মণিটি লুকাইয়া নিয়া বাড়িতে গেল।

রাজপুত্র ভালো হইলেন! মণিমালার সঙ্গে তাঁহার বিয়ে! পেঁচোর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হইবে কিনা—সাত বচ্ছর নিখোঁজ পেঁচোর জন্যে বুড়ি দেশে-দেশে লোক পাঠাইল।

মণিমালা বলিলেন, 'আমার এক বৎসর ব্রত, এক বৎসর পরে যা হয় হইবে।'

সকলে বলিলেন, 'আচ্ছা।'

মণি গেল, মণিমালা গেল, সাপের নিশাস গরল, সাপের পরশ হিম, আজ রাজপুত্র ঘুমে ঢুলু ঢুলু। ঢুলিয়া রাজপুত্র সাপের শয্যায় ঘুরিয়া পড়িলেন।

শিয়রের সাপ ফণা তুলিয়া গর্জিয়া উঠিল—আশের সাপ, পাশের সাপ গা-মোড়া দিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিল। নাগপাশের বাঁধনে রাজপুত্র সাপের শয্যায় বিষের ঘোরে অচেতন হইয়া রইলেন।

৫

দোলা-চৌদোলা পঞ্চকটক নিয়া সরোবরের পাড়ে আসিয়া মন্ত্রিপুত্র ডাকেন—'বন্ধু! বন্ধু! পথ দেখাও।'

না, সাড়াশব্দ কিছুই নাই! দিনের পর দিন গেল, রাত্রির পর রাত্রি গেল, বন্ধু আর সাড়া দিল না। তখন মন্ত্রিপুত্র ভাবিত হইয়া, পঞ্চকটক বনে রাখিয়া, বাহির হইলেন।

খানিক দূর গেলে, পথের লোকেরা বলিল, 'কে গো তুমি, কার বাছা, পেঁচোকে দেখিয়াছ? পেঁচো রাজার জামাই হইবে। পেঁচোর মা বুড়ি পেঁচোর খোঁজে পথে পথে ঘুরে।'

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি পেঁচোকে দেখিয়াছি; তা সে রাজত্ব রাজকন্যা পাইল কেন?'

লোকেরা সকল কথা বলিল।

মন্ত্রিপুত্র বলিল, 'বেশ বেশ! তা, পেঁচোর রূপটি—রূপটি যেন কেমন?' লোকেরা পেঁচোর রূপের কথা বলিল।

শুনিয়া মন্ত্রিপুত্র চলিয়া আসিলেন।

পরদিন মন্ত্রিপুত্র করিলেন কী, পোশাক-টোশাক ছাড়িয়া, গালে মুখে কালি, গায়ে-পায়ে ছেঁড়া কাণি, বুড়ির বাড়িতে গিয়া উপস্থিত। খকখক কাশি, খিলখিল হাসি, দুই হাতে গাছের ডাল—পেঁচোর নাচে উঠান কাঁপে।

আথিবিথি বুড়ি ছুটিয়া আসিল—'এই তো আমার বাছা! আহা আহা, বুকের মানিক, কোথায় ছিলি ঘরে এলি? আয় আয়, তোর জন্যে—

রাজ-রাজিত্বি দুধের বাটি
রাজকন্যা পরিপাটি
সোনার দানা মোহর থান—
সাতরাজার ধন মণিখান—

পেঁচোর-নূপ

—তোরি জন্যে রেখেছি!' আহ্লাদে আটখান বুড়ি গুড়ুসুড়ু মণিটি বাহির করিয়া চুপিচুপি পেঁচোর হাতে দিল। মণি পাইয়া পেঁচো তো তিন লাফে, ঘর!— 'মা, মা, আমি তো ভালো হইয়াছি! এই দেখ কেমন নূপ,— নূপের গাঙ্গে নূপ ভেস্যে যায়।'

বুড়ি বলিল, 'আহা, আহা বাছা আমার! এত রূপ নিয়া কোথায় ছিলি, রাজকন্যা তোর জন্য কাঁদিয়া পাগল!'

পরদিন বুড়ি—আউল চুলের ঝুঁটি বাঁধিয়া নড়ি ঠকঠক, রাজার কাছে গেল— 'তা, তা, রাজামশাই, রাজামশাই, রাজকন্যা বাহির কর— পেঁচো আমার আসিয়াছে। আহা আহা, পেঁচোর আমার যে রূপ—রূপ নয় তো নূপ—নূপের গাঙে নূপ ভেস্যে যায়।'

রাজা কী করেন, পেঁচোর সঙ্গে রাজকন্যা বিবাহ দিলেন।

৬

বাসরঘরে মন্ত্রিপুত্র পেঁচো রাজকন্যাকে সব কথা বলিলেন। শুনিয়া রাজকন্যা নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন; বলিলেন, আমার ভাই মণিমালাকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।'

তখন মন্ত্রিপুত্র চুপিচুপি বলিলেন, 'আমি যা যা বলি, মণিমালাকে চুপি চুপি এইসব কথা বলিও, আর এই জিনিশটি মণিমালার হাতে দিও।' বলিয়া মন্ত্রিপুত্র ফণীর মণিটি রাজকন্যার কাছে দিলেন।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল। চার দিনের দিনে, রাত পোহাইলে, মণিমালা বলিলেন, 'রাজপুত্র আমার ব্রত শেষ হইয়াছে, আমি আজ বরণসাজে সাজিয়া নদীর জলে স্নান করিব। আমার সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড দিও না, জন-জৌলুস দিও না; কেবল এক পেঁচো আর রাজকন্যা যাইবেন।'

অমনি রাজপুরি হইতে নদীর ঘাটে চাঁদোয়া পড়িল। মণিমালা, পেঁচোকে আর রাজকন্যাকে নিয়া বরণ-সাজে স্নান করিতে গেলেন। স্নান না স্নান! জলে নামিয়াই মণিমালা বলিলেন :

'মণি আমার, আমায় ভুলে কোথায় ছিলি?'
'বুড়ির থলে।'
'কোথায় এসে আবার মণি আমায় পেলি?'

'পেঁচোর গলে।'

মণিমালা বলিলেন :

'আজ তবে চল মণি অগাধ জলে!'

দেখিতে-না-দেখিতে নদীর জল দু-ফাঁক হইল, পেঁচো আর রাজকন্যাকে নিয়া মণিমালা তাহার মধ্যে অদেখা হইয়া গেলেন।

রাজপুত্র করেন— 'হায়। হায়!'

রাজা রানি করেন— 'হায়। হায়!'

মাথা খুঁড়িয়া বুড়ি মরিল,

রাজ্য ভরিয়া কান্না উঠিল।

৭

শিয়রের সাপ গুড়িসুড়ি, গায়ের সাপ ছাড়াছাড়ি—রাজপুত্র চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন।— তখন, মণির আলো মণির বাতি, ঢাকঢোলে হাজার কাঠি, রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র, মণিমালা আর রাজকন্যাকে লইয়া আপন দেশে চলিয়া গেলেন!

পাতালপুরির সাপের রাজ্যের সকল সাপ বাতাস হইয়া উড়িয়া গেল।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বাঁচাও বাঁচাও!—বন্ধু জন্মের মতো গেলাম!!''

সোনার কাটি
রূপার কাটি

১

এক রাজপুত্র, এক মন্ত্রিপুত্র, এক সওদাগরের পুত্র, আর এক কোটালের পুত্র—চারজনে খুব ভাব।

কেহই কিছু করেন না, কেবল ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান। দেখিয়া শুনিয়া রাজা, মন্ত্রী, সওদাগর, কোটাল বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; বলিয়া দিলেন—'ছেলেরা খাইতে আসিলে ভাতের বদলে ছাই দিও।'

মন্ত্রীর স্ত্রী, সওদাগরের স্ত্রী, কোটালের স্ত্রী কী করেন? চোখের জল চোখে রাখিয়া, ছাই বাড়িয়া দিলেন। ছেলেরা অবাক হইয়া উঠিয়া গেল।

হাজার হোক পেটের ছেলে; তার সামনে কেমন করিয়া ছাই দিবেন? রানি তাহা পারিলেন না। রানি পরমান্ন সাজাইয়া, থালার এককোণে একটু ছাইয়ের গুঁড়া রাখিয়া ছেলেকে খাইতে দিলেন।

রাজপুত্র বলিলেন, 'মা থালে ছাইয়ের গুঁড়া কেন?'

রানি বলিলেন, 'ও কিছু নয় বাবা, অমনি পড়িয়াছে।'

রাজপুত্রের মন মানিল না। বলিলেন, 'না মা, না বলিলে আমি খাইব না।' রানি কী করেন? সকল কথা ছেলেকে খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া, রাজপুত্র মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া উঠিলেন।

চার বন্ধুতে রোজ যেখানে আসিয়া মিলেন, সেইখানে আসিয়া সকলে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ কে কেমন খাইয়াছ?'

সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। তখন রাজপুত্র বলিলেন, 'ভাই, আর দেশে থাকিব না, চল দেশ ছাড়িয়া যাই।'

'সেই ভালো!' চারিজনে চারি ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

২

ঘোড়া ছুটাইতে ছুটাইতে ছুটাইতে ছুটাইতে, চার বন্ধু এক তেপান্তরের মাঠের সীমায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

মাঠের উপর দিয়া চারদিকে চার পথ।

কে কোন্ দিকে যাইবেন? ঠিক হইল—কোটালের দক্ষিণ, সওদাগরের উত্তর, মন্ত্রীর পশ্চিম আর রাজপুত্রের পুব। তখন সকলে মাথার পাগড়ির কাপড় ছিঁড়িয়া চার পথের মাঝখানে চার নিশান উড়াইয়া দিলেন—'যে-ই যখন ফিরুক অন্য বন্ধুদের জন্য এইখানে বসিয়া থাকিবে।'

চার ঘোড়া চার পথে ছুটিল।

সারা দিনমান চার জনে ঘোড়া ছুটাইলেন—কেহই কোথাও গ্রাম, নগর, বন্দর, বাড়ি কিছুই দেখিলেন না; সন্ধ্যার পর আবার সকলে একই জায়গায় আসিয়া উপস্থিত!

সে মস্ত এক বন! রাজপুত্র বলিলেন, 'দেখ, আমরা নিশ্চয় রাক্ষসের মায়ায় পড়িয়াছি; সাবধানে রাত জাগিতে হইবে! কিন্তু ক্ষুধায় শরীর অবশ, দেখ কিছু খাবার পাওয়া যায় কি-না।' সকলে ঘোড়া বাঁধিয়া খাবার সন্ধানে গেলেন।

বনে একটিও ফল দেখা যায় না, কোনো জীবজন্তু দেখা যায় না, কেবল পাথর-কাঁকর আর বড় বড় বটপাকুড়, তাল, শিমুলের গাছ!

হঠাৎ দেখেন, একটু দূরে এক হরিণের মাথা পড়িয়া রহিয়াছে। সকলের আনন্দের সীমা রহিল না; কোটালের পুত্র কাঠ কুড়াইতে গেলেন, সওদাগরের পুত্র জল আনিতে গেলেন, মন্ত্রিপুত্র আগুনের চেষ্টায় গেলেন, রাজপুত্র একটা গাছের শিকড়ে মাথা রাখিয়া গা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন।

রাজপুত্র ঘুমে। কাঠ নিয়া আসিয়া কোটাল দেখেন, আর বন্ধুরা আসে নাই। কাঠ রাখিয়া কোটাল হরিণের মাথাটি কাটিতে গেলেন।

তরোয়াল ছোঁয়াইয়াছেন—আর অমনি হরিণের মাথার ভিতর হইতে এক বিকটমূর্তি রাক্ষসী বাহির হইয়া কোটাল আর কোটালের ঘোড়াটিকে খাইয়া, আবার যেমন হরিণের মাথা তেমনি হরিণের মাথা হইয়া পড়িয়া রহিল।

জল আনিয়া সওদাগর দেখেন, কাঠ রাখিয়া কোটাল-বন্ধু কোথায় গিয়াছে। সওদাগর হরিণের মাথা কাটিতে গেলেন। সওদাগর, সওদাগরের ঘোড়া রাক্ষসীর পেটে গেল।

মন্ত্রী আসিয়া দেখেন—জল আসিয়াছে, কাঠ আসিয়াছে, বন্ধুরা কোথায়? 'আচ্ছা, মাংসটা বানাইয়া রাখি।'

'বাচাও বাঁচাও! বন্ধু, কোথায় তোমরা—
জন্মের মতো গেলাম!'

মন্ত্রিপুত্রের চিৎকারে রাজপুত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখেন, কী সর্বনাশ—রাক্ষসী!! রাক্ষস মন্ত্রিপুত্র আর মন্ত্রিপুত্রের ঘোড়া খাইয়া রাজপুত্রের ঘোড়াকে ধরিল। তরোয়াল খুলিয়া রাজপুত্র দাঁড়াইলেন; রাজপুত্রের পক্ষিরাজ চেঁচাইয়া বলিল, 'রাজপুত্র, পলাও, পলাও, আর রক্ষা নাই!! রাজপুত্র বলিলেন, 'পলাইব না—বন্ধুদের খাইয়াছে, রাক্ষসী মারিব!' রাজপুত্র তরোয়াল উঠাইলেন—চোখ আঁধার, হাত অবশ। রাক্ষসী আসিয়া রাজপুত্রকে ধরে ধরে—বনের গাছ-পাথর চারিদিক হইতে বলিয়া উঠিল, 'রাজপুত্র, পলাও, পলাও!' তখন রাজপুত্র, দিশা হারাইয়া, যেদিকে চক্ষু যায়, দৌড়াইতে লাগিলেন।

রাজপুত্র এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়া আর এক রাজার রাজ্যে—তবু রাক্ষসী পিছন ছাড়ে না। তখন নিরুপায় হইয়া রাজপুত্র সামনে এক আমগাছ দেখিয়া বলিলেন, 'হে আমগাছ! যদি তুমি সত্যকালের বৃক্ষ হও, রাক্ষসীর হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর।' আমগাছ দু-ফাঁক হইয়া গেল, রাজপুত্র তাহার মধ্যে গিয়া হাঁফ ছাড়িলেন।

রাক্ষসী গাছকে কত অনুনয়-বিনয় করিল, কত ভয় দেখাইল, গাছ কিছুই শুনিল না। তখন রাক্ষসী এক রূপসী মূর্তি ধরিয়া সেই গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই দেশের রাজা, বনে শিকার করিতে আসিয়াছেন। কান্না শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'দেখ তো, বনের মধ্যে কে কাঁদে?' লোকজন আসিয়া দেখে, আমগাছের নিচে পরমা সুন্দরী এক মেয়ে।

মেয়েটিকে রাজা রাজপুরীতে নিয়া গেলেন।

৩

রাজা সেই বনের মেয়েকে বিবাহ করিলেন। রানি হইয়া রাক্ষসী ভাবিল—'সেই রাজপুত্রকে কেমন করিয়া খাই!' ভাবিয়া রাক্ষসী, সাত বাসি পান্তা, চৌদ্দ বাসি তেঁতুলের অম্বল খাইয়া অসুখ বানাইয়া

হাড়মুড়মুড়ি ব্যারাম

বসিল। তারপর রাক্ষসী বিছানার নিচে শোলাকাঠি পাতিল। পাতিয়া সেই বিছানায় শুইয়া রঙ্গীমুখ ভঙ্গি করিয়া চোখের তারা কপালে তুলিয়া, একবার ফিরে এ-পাশ, একবার ফিরে ও-পাশ।

রাজা আসিয়া দেখেন—রানি খান না, দান না, শুকনো ঘরে জল ঢালিয়া চাঁচর চুলে আঁচড় কাটিয়া, রানি শুইয়া আছেন। দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কী রানি! কী হইয়াছে?'

কথা কি ফোটে? কোঁকাইয়া কোঁকাইয়া কত কষ্টে রানি বলিল, 'আমার হাড়মুড়মুড়ির ব্যারাম হইয়াছে।'

রানির গড়াগড়িতে বিছানার নিচের শোলাকাঠিগুলা মুড়মুড় করিয়া ভাঙিতেছিল কি-না! রাজা ভাবিলেন, তাই তো! রানির গায়ের হাড়গুলো মুড়মুড় করিতেছে। হায় কী হইবে!

কত ওষুধ, কত চিকিৎসা, রানির কি যে-সে অসুখ? অসুখ সারিল না! শেষে রানি বলিল, 'ওষুধে তো কিছু হইবে না, বনের সেই আমগাছ কাটিয়া তাহার তক্তার ধোঁয়া ঘরে দিলে আমার ব্যারাম সারিবে।'

রাজাজ্ঞা, অমনি হাজার হাজার ছুতোর গিয়া আমগাছে কুড়ুল মারিল! গাছের ভিতরে রাজপুত্র বলিলেন, 'হে বৃক্ষ, যদি সত্যকালের বৃক্ষ হও, তো আমাকে একটি আমের মধ্যে করিয়া ঐ পুকুরের জলে ফেলিয়া দাও।'

অমনি গাছ হইতে একটি আম টুব করিয়া পুকুরের জলে পড়িল; তখনি এক রাঘব বোয়াল সেটিকে খাবার মনে করিয়া এক হাঁয়ে গিলিয়া ফেলিল।

ছুতোরেরা আমগাছটি কাটিয়া লইয়া গিয়া তাহার তক্তা করিয়া রানির ঘরের চারিদিকে খুব করিয়া ধোঁয়া দিতেছে। কিন্তু রানি সব জানিতে পারিল। বলিল, 'না, এতেও কিছু হইল না। সে পুকুরে যে রাঘব বোয়াল আছে, তাহার পেটে একটি আম, সেই আমটি খাইলে আমার অসুখ সারিবে।'

সিঙ্গী জাল, ধিঙ্গী জাল—সব জাল নিয়া জেলেরা পুকুরে ফেলিল, রাঘব বোয়াল ধরা পড়িল। পেটের ভিতর আম, আমের ভিতর রাজপুত্র বলিলেন, 'হে বোয়াল, যদি তুমি সত্যকালের বোয়াল হও, তো আমাকে একটি শামুক করিয়া ফেলিয়া দাও।' বোয়াল রাজপুত্রকে শামুক করিয়া ফেলিয়া দিল। জেলেরা বোয়াল আনিয়া পেট চিরিয়া কিছুই পাইল না।

রাজা ভাবিলেন—'আর রানির অসুখ সারিল না!'

৪

এক গৃহস্থের বৌ নাইতে গিয়াছে, রাজপুত্র শামুক তাহার পায়ে ঠেকিল! গৃহস্থের বৌ শামুকটি তুলিয়া আছাড় দিয়া ভাঙিতেই ভিতর হইতে রাজপুত্র বাহির হইল। গৃহস্থের বৌ ভয়ে জড়সড়। রাজপুত্র বলিলেন, 'বৌ, ভয় করিও না, আমি মানুষ। রাক্ষসের ভয়ে শামুকের মধ্যে রহিয়াছি। তুমি আমার প্রাণ দিয়াছ, আজ হইতে তুমি আমার হাসন সখী।'

রাজপুত্র হাসন সখীর বাড়িতে আছেন।

রানি সব জানিল, রাজাকে বলিল, 'আমার অসুখ তো আর কিছুতেই সারিবে না, আমার বাপের দেশে হাসন চাঁপা নাটন কাটি, চিরণ দাঁতের চিকন পাটি, আর বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি আছে, সেইগুলি আনাইলে আমার অসুখ সারিবে।'

'কে আনিবে, কে আনিবে?'

'অমুক গৃহস্থের বাড়ি এক রাজপুত্র আছে, সে-ই আনিবে।'

অমনি হাজার হাজার পাইক ছুটিল।

চারিদিকে রাজার পাইক, হাসন সখী ভয়ে অস্থির। রাজপুত্র বলিলেন, 'হাসন সখী, আমারি জন্য তোমাদের বিপদ, আমি দেশ ছাড়িয়া যাই।'

বাহির হইতেই, পাইকেরা রাজপুত্রকে ধরিয়া লইয়া গেল! রাজার কাছে যাইতে রাজপুত্র বলিলেন, 'মহারাজ! রানি আপনার রক্ষসী—রাক্ষসীর হাত হইতে আমাকে বাঁচান।'

শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'মিথ্যা কথা। তাহা হইবে না, রানির বাপের দেশে হাসন চাঁপা নাটন কাঠি, চিরণ দাঁতের চিকন পাটি, আর বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি আছে, সেইসব তোমাকে আনিতে হইবে।'

রাজা এক পত্র দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

৫

কী করিবেন, রাজপুত্র চলিতে লাগিলেন। কোথায় সে হাসন চাঁপা নাটন কাটি, কোথায় বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি—কোথায় সে রানির বাপের দেশ? রাজপুত্র ভাবিলেন—হায়! রাক্ষসীর হাত হইতে কিসে এড়াই! রাজপুত্র যেদিকে চক্ষু যায় চলিতে লাগিলেন।

কত দিন, কত রাত চলিতে চলিতে, এক জায়গায় আসিয়া রাজপুত্র দেখেন, এক মস্ত পুরি। রাজপুত্র বলিলেন, 'আহা! এত দিনে আশ্রয় পাইলাম।'

পুরির মধ্যে গিয়া মানুষজন কিছু দেখিতে পান না—খুঁজিতে খুঁজিতে এক ঘরে দেখেন, সোনার খাটে গা, রুপোর খাটে পা, এক রাজকন্যা শুইয়া আছেন। রাজপুত্র ডাকাডাকি করিলেন—রাজকন্যা উঠিলেন না! তখন রাজপুত্র দেখেন, বিছানার দুইদিকে দুইটি কাটি। শিয়রের কাটিটা রুপার, পায়ের দিকের কাটিটা সোনার। রাজপুত্র শিয়রের কাটি পায়ের দিকে নিলেন, পায়ের দিকের কাটি শিয়রে নিলেন! রাজকন্যা উঠিয়া বসিলেন—'কে আপনি! দেব না দৈত্য, দানব না মানব—এখানে কেমন করিয়া আসিলেন? পলাইয়া যান—পলাইয়া যান—এ রাক্ষসের পুরি।'

রাজপুত্রের প্রাণ শুকাইয়া গেল —'এক রাক্ষসের হাত হইতে আসিলাম, এখানেও রাক্ষস! রাজকন্যা, আমি কোথায় যাই?'

রাজকন্যা বলিলেন, 'আচ্ছা আপনি কে আগে বলুন।'

রাজপুত্র সকল কথা বলিলেন, তারপর বলিলেন, 'আমি তো সেই রাক্ষসী রানির হাত আজও এড়াইতে পারিলাম না, তা এ রাক্ষসের পুরিতে এমন এক রাজকন্যা কেন?'

রাজকন্যা বলিলেন, 'এই পুরি আমার বাপের; রাক্ষসেরা আমার বাপ-মা, রাজ-রাজত্ব খাইয়াছে, কেবল আমাকে রাখিয়াছে। যদি আমি পলাইয়া যাই সেইজন্য বাহিরে যাইবার সময় রাক্ষসেরা সোনার কাটি রুপার কাটি দিয়া আমাকে মারিয়া রাখিয়া যায়।'

শুনিয়া রাজপুত্র ভাবিতে লাগিলেন, কী করিয়া দুইজনে রাক্ষসের হাত হইতে এড়াইবেন।

'আঁই লোঁ মাঁই লোঁ, মাঁনুষের গন্ধ পাঁই লোঁ।
ধঁরে ধঁরে খাঁই লোঁ!'

সেই সময় চারিদিক হইতে রাক্ষসেরা শব্দ করিয়া আসিতে লাগিল। রাজকন্যা বলিলেন, 'রাজপুত্র শিগগির আমাকে মারিয়া ফেলিয়া ঐযে শিবমন্দির আছে, ওরি মাঝে ফুল-বেলপাতার নিচে লুকাইয়া থাকুন।' আঁই লোঁ মাঁই লোঁ করিয়া রাক্ষসেরা আসিল। বুড়ি রাক্ষসী রাজকন্যাকে বাঁচাইয়া বলিল :

'নাঁতনি লোঁ নাঁতনি! মাঁনুষ মাঁনুষ গঁন্ধ কঁয়—
মানুষ আঁবার কোঁথায় রঁয়?'

রাজকন্যা বলিলেন, 'মানুষ আবার থাকিবে কোথায়; আমিই আছি, আমাকে খাইয়া ফেল।'

বুড়ি বলিল, 'উ হু হুঁ নাঁতনি লোঁ, তাঁ কি পাঁরি! —এঁই নে নাঁতনি তোঁর জঁন্যে কঁত খাঁবার এঁনেচি।' নাতনিকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া বুড়ি আর সকল রাক্ষস, নাকে-কানে হাঁড়ি হাঁড়ি সরষের

তৈল ঢালিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রাজকন্যা আয়ীর মাথার পাকা চুল তোলেন আর ডেলা ডেলা এক এক উকুন দুই পাথরের চাপ দিয়া কটাস কটাস করিয়া মারেন।

রাজকন্যার রাত এই ভাবেই যায়।

পরদিন আবার রাজকন্যাকে মারিয়া রাখিয়া রাক্ষসেরা চলিয়া গেল। রাজপুত্র বাহির হইয়া আসিয়া, রাজকন্যাকে জিয়াইলেন, দুইজনে স্নান খাওয়াদাওয়া করিলেন। রাজপুত্র বলিলেন, 'রাজকন্যা, এভাবে কতদিন থাকিব? আজ যখন বুড়ি আসিবে, তখন দুই কথা ছল ভান করিয়া, ওদের মরণ কিসে আছে, তাই জিজ্ঞাসা করিও।'

আবার রাক্ষসেরা আসিলে, রাজপুত্র শিবমন্দিরে গিয়া লুকাইলেন। রাজকন্যাকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া বুড়ি খাটের উপর বসিল। রাজকন্যা বলিলেন, 'আয়ী, লো আয়ী, কত রাজ্য ঘুরিয়া হাঁপাইয়া হুপাইয়া আইলি, আয় একটু বাতাস করি, পাকা চুল দু-গাছ তুলিয়া দি!'

'ওঁ মাঁ লোঁ মাঁ লক্ষ্মি!' বুড়ি হাসিয়া চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ লোঁ হ্যাঁ নাঁতনি পাঁ-টা তোঁ কঁটকট কঁচ্ছে। এঁকটু টিপিয়া দিবি?'

পাঁ-টা কঁটকট কঁচ্ছে

'তা আর দিব না আয়ীমা?' হাঁড়ি ভরা সরষের তৈল আয়ীর পায়ের ফাটলে দিয়া, রাজকন্যা আয়ীর পা টিপিতে বসিলেন।

পা টিপিতে বসিয়া রাজকন্য চোখে তেল দিয়া কাঁদেন—এক ফোঁটা চোখের জল বুড়ির পায়ে পড়িল। চমকিয়া উঠিয়া জলফোঁটা আঙুলের আগায় করিয়া নিয়া জিভে দিয়া লোনা লাগিল। বুড়ি বলিল, 'নাঁতনি তুঁই কাঁদছিস—কেঁন লোঁ, কেঁন লোঁ? তোঁর আঁবার দুঁঃখু কিঁসের?'

রাজকন্যা বলিলেন, 'কাঁদি আয়ীমা, কবে বা তুই মরিয়া যাইবি, আর স্কল রাক্ষসে আমাকে খাইয়া ফেলিবে।'

কুলার মতো কান নাড়িয়া, মূলার মতো দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া আয়ী বলিল, 'ওরে আমার সোঁনার নাঁতিন, মোঁদের কিঁ মঁরণ আঁছে যেঁ মঁরিব? এ পিঁথিমির মোঁদের কিঁচ্ছুতে মঁরণ নাই! এঁক ঐ পুঁকুরে যেঁ ফঁটিকস্তঁম্ভ আঁছে, তাঁর মধ্যে এঁক সাঁতফণা সাঁপ আঁছে; এঁক নিশ্বাসে উঠিয়া ঐ সোঁনার তাঁলগাঁছের তাঁলপত্র খাঁড়া পাঁড়িয়া যঁদি কোঁনো রাঁজপুত্র ফঁটিকস্তঁম্ভ ভাঁঙ্গিয়া সাঁপ বাঁহির কঁরিয়া বুঁকের উঁপর রাঁখিয়া কাঁটিতে পাঁরে, তঁবেই মোঁদের মরণ! তাঁ মাঁটিতে যঁদি এঁকফোঁটা রক্ত পঁড়ে, তোঁ এঁক এঁক ফোঁটায় সাঁত সাঁত হাঁজার কঁরিয়া রাক্ষস জন্ম নিবে!'

শুনিয়া রাজকন্যা বলিলেন, 'তবে আর কী আয়ীমা! তা কেউ পারিবে না, তোরাও মরিবি না— আমারও আর ভাবনা নাই। আচ্ছা আয়ীমা! অমুক দেশের রাজার রানি যে রাক্ষসী তার আয়ু কিসে আয়ীমা? আর হাসন চাঁপা নাটন কাটি, চিরণ দাঁতের চিকন পাটি, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি কোথায় পাওয়া যায় আয়ীমা?'

আয়ীমা বলিল, 'আছে লোঁ নাঁতনি আঁছে! যেঁ ঘরে তোঁর বাপ থাঁকত সেঁই ঘঁরে আছে, আঁর সেঁ ঘরে যেঁ এঁক শুঁক, তারি মধ্যেঁ আঁমার মেঁয়ে সেঁই রাঁনির প্রাণ! কাঁউকে যেঁন কঁস নেঁ নাঁতনি, সঁব তোঁ আঁমি তোঁকেই দোঁবো।'

পরদিন বুড়ি সকল রাক্ষস নিয়া বাহির হইল; বলিয়া গেল— 'নাতনি লোঁ, আজ আঁমরা এঁই কাঁছেই থাকিব।' যেদিন রাক্ষসেরা দূরের কথা বলে, সেদিন কাছে থাকে; যেদিন কাছের কথা বলে সেদিন খুব দূরে যায়। রাক্ষসেরা চলিয়া গেলে রাজপুত্র আসিয়া রাজকন্যাকে বাঁচাইয়া সকল কথা শুনিলেন। তখনি স্নান-টান করিয়া, কাপড়চোপড় ছাড়িয়া শিবমন্দিরে ফুল-বেলপাতা অঞ্জলি দিয়া, রাজপুত্র নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তালগাছে উঠিয়া তালপত্র খাঁড়া পাড়িলেন। তাহার পর পুকুরে নামিয়া

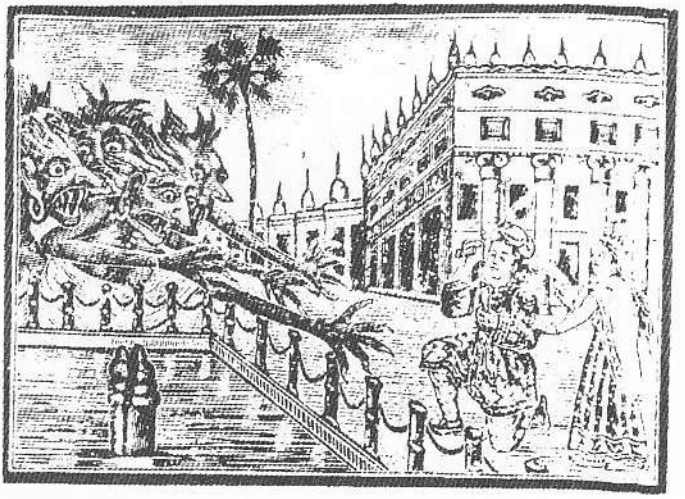

মুঁণ্ডুটা চিঁবিয়া খাঁই লোঁ

স্ফটিকস্তম্ভ ভাঙিয়া দেখেন, সাতফণা সাপ। রাজপুত্র সাপ নিয়া উপরে আসিলেন। পৃথিবীর সকল রাক্ষসের মাথা টনটন করিয়া উঠিল—যে যেখানে ছিল রাক্ষসেরা ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আলুথালু তল, এ-ই লম্বা পা ছুড়িতে ছুড়িতে বুড়ি সকলের আগে ছুটিয়া আসে—

'আঁই লোঁ মাঁই লোঁ, নাঁতনি লোঁ নাঁতনি লোঁ—
তোঁর মঁনে এঁই ছিল লোঁ!
তোঁর মুঁণ্ডুটা চিঁবিয়া খাঁই লোঁ!

আর মুণ্ডু খাওয়া! রাজকন্যা বলিলেন, 'রাজপুত্র, শিগগির সাপ কাটিয়া ফেল!'

বুকের উপর রাখিয়া তালপত্র খাঁড়া দিয়া রাজপুত্র সাপের গলা কাটিয়া ফেলিলেন। এক ফোঁটা রক্তও পড়িতে দিলেন না।

সব ফুরাইল, যত রাক্ষস পুকুরপাড়ে আসিতে আসিতেই মুণ্ডু খসিয়া পড়িয়া গেল।

রাজা, সভার সকলে থরথর কাঁপেন

রাজপুত্র-রাজকন্যা হাঁপ ছাড়িয়া ঘরে গেলেন। এক কুঠরিতে হাসন চাঁপা নাটন কাঠি, চিরণ দাঁতের চিকন পাটি সব রহিয়াছে, আর এক শুকপাখি ছটফট করিয়া চেঁচাইতেছে। সব লইয়া রাজপুত্র বলিলেন, 'রাজকন্যা, আমার দেশে চল।'

রাজকন্যাকে একখানে রাখিয়া, রাজপুত্র রানির ওষুধ আর শুকটি নিয়া রাজার কাছে গেলেন—'মহারাজ, আজ একবার সভা করিবেন, আমি রানির অসুখ সারাইব।'

ভারি খুশি হইয়া রাজা সভা করিয়া বসিলেন। রাজপুত্র কাঠি, পাটি, চাঁপা, কাঁকুড় সভায় রাখিলেন। সকলে দেখে, কী আশ্চর্য! রাজপুত্র বলিলেন, 'মহারাজ, রানিকে নিজে আসিয়া এইগুলি নিতে হইবে।'

রানির তো ওদিকে হাড়মুড়মুড়ি গিয়া কলজে-ধড়ফড়ি ব্যারাম হইয়াছে—'ছেলেটা তো তবে সব নাশ করিয়া আসিয়াছে! আজ ওকে খাব! রাজ্য খাব!'

রাজ্য খা! সভার দুয়ারে রানি পা দিয়াছে! আর রাজপুত্র বলিলেন, 'ও রাক্ষসী, আমাকে খাবি? এই দ্যাখ!' রাজপুত্র খাঁচা হইতে শুকটিকে বাহির করিয়া এক টানে শুকের গলা ছিঁড়েন আর কী! রাক্ষসী বলিল, 'খাঁব না, খাঁব না, রাঁখ রাঁখ!! তোঁর পাঁয়ে পঁড়ি!' রানির মূর্তি কোথায়, দাঁত-বিকটী রাক্ষসী!!

রাজা, সভার সকলে থরথর কাঁপেন।

রাজপুত্র বলিলেন, 'দে, আমার কোটালবন্ধু দে, কোটাল বন্ধুর ঘোড়া দে! দে, আমার সওদাগরবন্ধু দে, সওদাগরবন্ধুর ঘোড়া দে! মন্ত্রিবন্ধু, মন্ত্রি ঘোড়া দে, আমার ঘোড়া দে!'

রাক্ষসী হোয়াক হোয়াক করিয়া একে একে সব উগরিয়া দিল! তখন রাজপুত্র বলিলেন, 'মহারাজ, দেখিলেন, রানি রাক্ষসী কিনা?—

'এইবার রাক্ষসী নিপাত যাও!!'

শুকের গলা ছিঁড়িল—রাক্ষসী গ্যাঁ গ্যাঁ করিয়া মরিয়া গেল! রাক্ষসীর মরণ—মরিতে-মরিতেও মরণকামড়ি—রাজার সিংহাসন ধরিয়া টান মারে আর কী! সার সার করিয়া রাজা বাঁচিয়া গেলেন।

ঘাম দিয়া সকলের জ্বর ছাড়িল। রাজা বলিলেন, 'ধন্য তুমি কোথাকার রাজপুত্র! যত ধন চাও, ভাণ্ডার খুলিয়া নিয়া যাও!'

রাজপুত্র বলিলেন, 'আমি কিছুই চাই না, এতদিনে রাক্ষসীর হাত হইতে সকলে বাঁচিলাম—এখন আমরা দেশে যাইব।' রাজা শুনিলেন না। ভাণ্ডার খুলিয়া সকল ধনরত্ন বাহির করিয়া দিলেন।

রাজকন্যাকে লইয়া রাজপুত্র, রাজপুত্রের তিন বন্ধু, দেশে গেলেন।

পৃথিবীতে যত রাক্ষস জন্মের মতো ধ্বংস হইয়া গেল।

দেশে গিয়া রাজপুত্রেরা, বাপ-মায়ের আদরে, সুখে দিন গণিতে লাগিলেন।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

চ্যাং ব্যাং

নতুন বৌ, হাঁড়ি ঢাক, শেয়াল পণ্ডিত ডাকে,
চি চি চি কিচির-মিচির ঝুলির ভিতর থাকে।

পড়ুয়াদের পড়ায় কোথায় কাঁপে শটির বন,
সাতটি ছেলে কুমির দিল করে' সমর্পণ?
তালগাছেতে ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং কোথায় হল—বাহ্!

টিকি নাড়ে বুড়ো বামুন, খেতে গেল পিঠে,
খ্যাংরা দিয়ে বাম্নী কোথায় মিঠে দিল পিঠে?
রাগে বামুন গেল কোথায়, এল কবে আর?
কেমন করে হল রে বার রাজকন্যার হার!

কাঠুরে-বউ ব্রত নিয়ম কেমন শশা খেল?
কোল-জোড়া ধন মানিক-রতন কেমন ছেলে পেল?
ব্যাঙ ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ—কামার বুড়ো কাঁপে থর্ থর্—
রাজকন্যা চোখ-বিন্ধুলীর কেমন এল বর!
কোথায় এত থলের ভিতর চিঁচি মিচি রব?—
চ্যাং ব্যাং-এর বাসার মাঝে লুকিয়ে ছিল সব!

শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা

শিয়াল পণ্ডিত

১

একে যে ছিল শেয়াল,
তার বাপ দিয়েছিল দেয়াল;
তার ছেলে সে, কম বা কিসে?
তারও হল খেয়াল!

ইয়া-ইয়া গোঁফে চাড়া দিয়া, শিয়াল পণ্ডিত শটির বনে এক মস্ত পাঠশালা খুলিয়া ফেলিল।

চিঁ চিঁ পোকা, ঝিঁ ঝি পোকা, রামফড়িঙের ছা,
কচ্ছপ, কেন্নো হাজার পা,
কেঁচো, বিছে, গুবরে, আরশুলা, ব্যাং,
কাঁকড়া, মাকড়া—এই—এই—ঠ্যাং!

শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় এত এত পড়ুয়া।

পড়ুয়াদের পড়ায়
পণ্ডিতের সাড়ায়,
শটির বনে দিনরাত হট্টগোল।

দেখিয়া শুনিয়া এক কুমির ভাবিল—'তাই তো! সকলের ছেলেই লেখাপড়া শিখিল, আমার ছেলেরা বোকা হইয়া থাকিবে?' কুমির, শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় সাত ছেলে নিয়া গিয়া হাতে খড়ি দিল।

ছেলেরা আঞ্জি ক খ পড়ে। শিয়াল বলিল, 'কুমির মশাই, দেখেন কী—সাত দিন যাইতে-না-যাইতে আপনার এক-এক ছেলে বিদ্যাগজগজ ধনুর্ধর হইয়া উঠিবে।' মহাখুশি হইয়া কুমির বাড়ি আসিল।

পণ্ডিত মহাশয় পড়ান, রোজ একটি করিয়া কুমিরের ছানা দিয়া জল খান। এইরকম করিয়া ছয় দিন গেল।

কুমির ভাবিতেছে—কাল তো আমার ছেলেরা বিদ্যাগজগজ হইয়া আসিবে, আজ একবার দেখিয়া আসি। ভাবিয়া কুমিরানিকে বলিল, 'ওগো, ইলিশ-খলিসের চচ্চড়ি, রুই-কাতলার গড়গড়ি,

চিতল-বোয়ালের মড়মড়ি সব তৈয়ার করিয়া রাখো, ছেলেরা আসিয়া খাইবে।' বলিয়া কুমির পুরান চটের থান, ছেঁড়া জালের চাদর, জেলে-ডিঙির টোপর পরিয়া এক-গাল শেওলা চিবাইতে চিবাইতে, ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে গিয়া উপস্থিত— 'পণ্ডিত মশাই, পণ্ডিত মশাই, দেখি, দেখি, ছেলেরা আমার কেমন লেখাপড়া শিখিয়াছে।'

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'আসুন, আসুন, বসুন; হ্যাঁরে, গুবরে তামাক দে; আরে ফড়িঙে, নস্যির ডিবে নিয়ে আয়। —হ্যাঁরে, কুমির-সুন্দরেরা কোথায় গেল রে? বসুন, বসুন, আমি ডাকিয়া নিয়া আসি।'

জেলে-ডিঙির টোপর

গর্তের ভিতরে গিয়া শিয়াল পণ্ডিত সেই শেষ-একটি ছানাকে উঁচু করিয়া সাত বার দেখাইল। বলিল, 'কুমির মশাই, এত খাটিলাম খুটিলাম, আর একটুর জন্য কেন খুঁত রাখিবে? সব ছেলেই

বিদ্যাগজগজ হইয়া গিয়াছে, আর একদিন থাকিলেই একেবারে ধনুর্ধর হইয়া ঘরে যাইতে পারিবে।' কুমির বলিল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ, তাহাই হইবে।'

বোকা কুমির খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন শিয়াল পণ্ডিত বাকি ছানাটিকে দিয়া সবশেষ-জলযোগ সারিয়া—পাঠশালা পুঠশালা ভাঙিয়া—পলায়ন!

পিট্টান তো পিট্টান—কুমির আসিয়া দেখে—পড়ুয়ারা পড়ে না, শিয়াল পণ্ডিত ঘরে নাই—শটির বন খালি। কুমির তখন সব বুঝিতে পারিল। গালে চড়, মাথায় চাপড়, হাপুস নয়নে কাঁদিয়া, কুমির বলিল, 'আচ্ছা পণ্ডিত— দাঁড়া—

আর কি কাঁকড়া খাবি না?
আর কি খালে যাবি না?
ওই খালে তো কাঁকড়া খাবি—
দেখি কী করে
মুই কুমিরের হাত এড়াবি।'

কুমির চুপ করিয়া খালের জলে লুকাইয়া রহিল।

কদিন যায়, শিয়াল পণ্ডিত খালের ঐ ধারে ধারে ঘুরে, প্রাণান্তেও জলটিতে পা ছোঁয়ায় না। শেষে পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—তার উপর, ওপারের চড়ায় কাঁকড়ারা ছায়ে পোয়ে দলে দলে দাঁড়া বাহির করিয়া ধিড়িং ধিড়িং নাচে—আর কি সয়? সব ভুলিয়া টুলিয়া, যাক প্রাণ, থাক মান—জলে দিলেন ঝাঁপ!

আর কোথা যায়—ছত্রিশ গণ্ডা দাঁতে কুমির, পণ্ডিতের ঠ্যাংটি ধরিয়া ফেলিল!

টানাটানি হুড়াহুড়ি—পণ্ডিত এক নলখাগড়ার বনে গিয়া ঠেকিলেন। অমনি এক নলের আগা ভাঙিয়া হাসিয়া পণ্ডিত বলিল, 'হাঃ! কুমির মশাই এত বোকা তা তো জানিতাম না! কোথায় বা

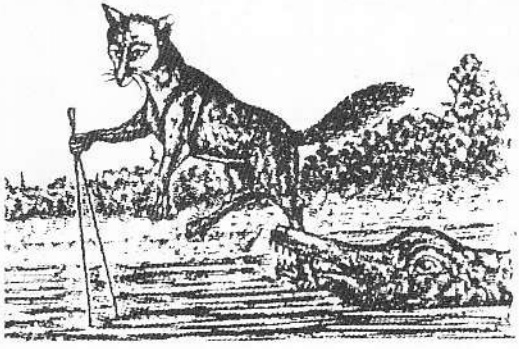

লাঠিটা ছাড়িয়া ঠ্যাংটাই ধরিতেন

আমার ঠ্যাং, কোথায় বা লাঠি! ধরুন ধরুন, লাঠিটা ছাড়িয়া ঠ্যাংটাই ধরিতেন!' কুমির ভাবিল, 'অ্যাঁ,—লাঠি ধরিয়াছি?' ধর ধর—ঠ্যাং ছাড়িয়া কুমির লাঠিতে কামড় দিল।

নল ছাড়িয়া দিয়া পণ্ডিত তিন লাফে পার— 'কুমির মশাই, হোক্কা হুয়া! আবার পাঠশালা খুলিব, ছেলে পাঠাইও।'

আবার দিন যায়, শিয়ালের আর লেজটিতেও কুমির পা দিতে পারে না। শেষে একদিন মনে মনে অনেকে যুক্তিবুদ্ধি টুদ্ধি আঁটিয়া—সটান লেজ, রোদমুখে হাঁ, ঢেঁকি অবতার হইয়া—কুমির খালের চড়ায় হাত ছড়াইয়া একেবারে মরিয়া পড়িয়া রহিল। শিয়াল পণ্ডিত সেই পথে যায়। দেখিল, কুমির তো মরিয়াছে! যাই, শিয়ালীকে নিমন্ত্রণটা দিয়া আসি।'

কিন্তু পণ্ডিতের মনে-মনে সন্দ! গোঁফে তিন চাড়া দিয়া দাঁত মুখ চাটিয়া চুটিয়া বলিতেছে, 'আহা, বড় সাধুলোক ছিল গো! কী হয়েছিল গো! কী করে গেল গো! আচ্ছা, লোকটা যে মরিল তার লক্ষণ কী? হুঁ হুঁ—

কান নড়বে পটাপট
লেজ পড়বে চটাচট

হুঁ হুঁ

তবে তো মড়া! এ বেটা এখনো তবে মরেনি!'

কুমির ভাবিল, কথা বুঝি সত্যি—কান নাই তবু কুমির মাথা ঘুরাইয়া কান নাড়ে, চটচটাচট লেজ আছাড়ে।

দূরে ছিল কতকগুলি রাখাল—

'ওরে! ওই সে কুমির ডাঙায় এল,
যে ব্যাটা সেদিন বাছুর খেল!'—

কাস্তে, লাঠি, ইট, পাটকেল ধড়াধ্বড় পড়ে—হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া আসিয়া রাখালের দল কুমিরের পিছনে লাগিয়া গেল।

শিয়াল পণ্ডিত তিন ছুটে চম্পট—

'হোক্কা হোয়া, কুমির মশাই
নমস্কার! এবার পালাই!'

২

অনেক দূরে আসিয়া শিয়াল পণ্ডিত এক বেগুনের ক্ষেতে ঢুকিলেন।

ক্ষুধায় পেটটি আনচান, মনের সুখে বেগুন খান;

খেতে খেতে হঠাৎ কখন নাকে ফুটল কাঁটা,
'হ্যাঁচ—হ্যাঁচ—হ্যাঁচ—ফ্যাঁচ—ফ্যাঁচ—ফ্যাচ—'
কিছুতেই কিছু না, রক্তে ভেসে গেল গা-টা

শেষে, কাবুজাবু হইয়া শিয়াল নাপিতের বাড়ি গেলেন—

'নরসুন্দর নরের সুন্দর ঘরে আছ হে?
বাইরে একটু এস রে ভাই নরুনখানা নে'।'

নাপিত বড় ভালোমানুষ ছিল; নরুন লইয়া আসিয়া বলিল, 'কে ভাই, শিয়াল পণ্ডিত? তাই তো, এ কী! আহা-হা, নাকটা তো গিয়াছে!' দুফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া শিয়াল বলিল:

'ওই তো দুঃখে কাঁদি রে ভাই, মন কি আমার আছে?
তুমি ছাড়া আর গতি নাই—এলাম তোমার কাছে।'

নাপিত বড় দয়াল, মন গলিল। বলিল, 'বস,বস,কাঁটা খুলিয়া দিতেছি।'

একে হল আর,
শিয়ালের নাক কেটে গেল, কাঁটা করতে বার!

'উঁয়া, উঁয়া! হুঁয়া, হুঁয়া! ক্যাঃ, ক্যাঃ। ওরে হতভাগা পাজি পাষণ্ড নাপ্‌তে! দ্যাখ্ তো, দ্যাখ্ তো কী করেছিস। দে ব্যাটা, আগে আমার নাক জুড়িয়া দে—নইলে তোকে দেখাচ্ছি!'

ভালোমানুষ নাপিত ভয়ে থতমত; বলিল, 'দাদা! বড় চুক হইয়া গিয়াছে; মাফ কর ভাই, নইলে গরিব প্রাণে মারা যাই।'

একে হল আর

শিয়াল বলিল, 'আচ্ছা যা,—যা হইবার তা তো হইল—তবে তোর নরুনখানা আমাকে দে, তোকে ছাড়িয়া দিতেছি।'

কী করে? নাপিত শেয়ালকে নরুনখানা দিল। নরুন পাইয়া শিয়াল বলিল, 'আচ্ছা, তবে আসি।'

শিয়াল এক কুমোরের বাড়ির সামনে দিয়া যায়; দেখিয়া কুমোর বলিল, 'কে হে বট ভাই, কে যাচ্ছে? মুখে ওটা কী?'

শিয়াল বলিল, 'কুমোর ভাই নাকি? ও একটা নরুন নিয়া যাচ্ছি।'

কুমোরেরও একটা নরুনের বড় দরকার—বলিল, 'তা ভাই, দেখি দেখি, তোমার নরুনটা কেমন?'

পরখ করিতে করিতে নরুনটা মট করিয়া ভাঙিয়া গেল; কুমোর বলিল, 'আহ্—হা!'

চটিয়া উঠিয়া শিয়াল বলিল, 'আজ্ঞে কুমোরের পো, সেটি হবে না। ভালো চাও তো আমার নরুনটি জোগাইয়া দাও!'

সে গাঁয়ে কামার নাই। নিরুপায় হইয়া কুমোর বলিল, 'এখন কী করি ভাই, মাফ না করিলে যে গরিব মারা যায়!'

শিয়াল বলিল, 'তবে একটি হাঁড়ি দাও!'

কুমোর একটি হাঁড়ি দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। হাঁড়ি লইয়া শিয়াল আবার চলিতে লাগিল। এক বিয়ের বর যায়! বোম পটকা আতশবাজি ছুড়িতে ছুড়িতে সকলে চলিয়াছে। অন্ধকারে, কে জানে—একটা পটকা ছুটিয়া গিয়া শিয়ালের হাঁড়িতে পড়িল। হাঁড়িটি ফাটিয়া গেল। দুই চোখ ঘুরাইয়া আসিয়া শিয়াল বলিল, 'কে হে বাপু বড় তুমি বর যাচ্ছ— বাজি পোড়াবার আর জায়গা পাও নাই? ভালো চাও আমার হাঁড়িটি দাও!'

বর ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। সকলে বলিল, 'মাফ কর ভাই, মাফ কর ভাই, নইলে আমরা সব মারা যাই।'

শিয়াল বলিল, 'সেটি হবে না। কনেটিকে আমাকে দাও, তারপর তোমরা যেখানে খুশি যাও।'

কী আর করে?—বর, কনেটি শিয়ালকে দিল।

কনে পাইয়া শিয়াল সেখান হইতে চলিল।

এক ঢুলির বাড়ি গিয়া শিয়াল বলিল, 'ঢুলি ভাই, ঢুলি ভাই, তোমরা কজন আছ?—আমি বিয়ে করিব, সব ঢোল বায়না কর দেখি। কনেটি তোমার এখানে থাকিল, আমি পুরুতবাড়ি চলিলাম।'

ঢুলি ঢোল বায়না করিতে গেল, শিয়াল পুরুতবাড়ি চলিল। ঢুলিবউ কুটনা কাটিতে বসিয়াছে। কনেটি ঝিমাইতে ঝিমাইতে বঁটির উপরে পড়িয়া গিয়া কাটিয়া দুইখানা হইয়া গেল। ভয় ঢুলিবউ দুই টুকরা নিয়া খড়ের গাদায় লুকাইয়া রাখিয়া আসিল।

পুরুত নিয়া আসিয়া শিয়াল দেখে, কনে নাই!—'ভালো চাও তো ঢুলিবউ কনেটি এনে দাও!' ভয়ে ঢুলিবউ ঘরে উঠিয়া বলে, 'ওমা, কী হবে গো!'

তবে একটি হাঁড়ি দাও

শিয়াল বলিল, 'সে সব কথা থাক, ঢুলির ঢোলটি দাও তো ছাড়িয়া দিচ্ছি!'
ঢুলিবউ ভাবিল—বাঁচিলাম! তাড়াতাড়ি ঢোলটি আনিয়া দিয়া ঘরে গিয়া দুয়ার দিল।
ঢোল নিয়া গিয়া শিয়াল এক তালগাছের উপর উঠিয়া বাজায় আর গায়—

তাক ডুমা ডুম ডুম!!!
বেগুন ক্ষেতে ফুটল কাঁটা—তাক ডুমা ডুম ডুম!
কাঁটা খুলতে কাটল নাক,
তাক ডুমা ডুম ডুম!
নাকুর বদল নরুন পেলাম
তাক ডুমা ডুম ডুম!
নরুন দিয়ে হাঁড়ি পেলাম—তাক ডুমা ডুম ডুম!
হাঁড়ির বদল কনে পেলাম—তাক ডুমা ডুম ডুম!
কনে গিয়ে ঢোল পেয়েছি—তাক ডুমা ডুম ডুম!
ডাগুম ডাগুম ডুম ডুমা ডুম!
ডুম ডুমা ডুম ডুম!!

মনের আনন্দে শিয়াল যেই নাচিয়া উঠিয়াছে, অমনি পা হড়কাইয়া গিয়া —

বাহ্!!!

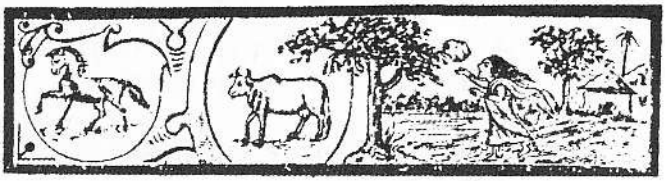

সুখু আর দুখু

১

ক তাঁতি, তার দুই স্ত্রী। দুই তাঁতিবউর দুই মেয়ে—সুখু আর দুখু। তাঁতি, বড় স্ত্রী আর বড়মেয়ে সুখুকে বেশি আদর করে। বড় স্ত্রী আর বড়মেয়ে ঘর-সংসারের কুটাটুকু ছিঁড়িয়া দুইখানা করে না। কেবল বসিয়া বসিয়া খায়। দুখু আর তার মা সূতা কাটে, ঘর নিকোয়; দিনান্তে চারটি ভাত পায়, আর সকলের গঞ্জনা সয়।

একদিন তাঁতি মরিয়া গেল। অমনি বড়তাঁতিবউ তাঁতির কড়িপাতি যা ছিল সব লুকাইয়া ফেলিল; আপন মেয়ে নিয়া, দুখু আর দুখুর মাকে ভিন্ন করিয়া দিল।

সুখুর মা আজ হাটের বড়মাছের মুড়াটা আনে, কাল হাটের বড় লাউটা আনে, রাঁধে, বাড়ে; সতিন, সতিনের মেয়েকে দেখাইয়া দেখাইয়া খায়।

দুখুর মা আর দুখু দিনেরাত্রে সূতা কাটিয়া কোনোদিন একখানা গামছা, কোনোদিন একখানা ঠেটি—এই হয়। তাই বেচিয়া একবুড়ি পায়, দেড়বুড়ি পায়; তাই দিয়া মায়ে-ঝিয়ে চারিটি অন্ন পেটে দেয়।

একদিন, সূতা-নাতা ইঁদুরে কাটে, তুলাটুকু নেতিয়ে যায়—দুখুর মা সুতাগোছা এলাইয়া দিয়া, তুলা ডালা রোদে দিয়া, ক্ষারকাপড়খানা নিয়া ঘাটে গিয়াছে। দুখু তুলা আগলাইয়া বসিয়া আছে। এমন সময় এক দমকা বাতাস আসিয়া দুখুর তুলাগুলা উড়াইয়া নিয়া গেল। একটু তুলাও দুখু ফিরাইতে পারিল না; শেষে দুখু কাঁদিয়া ফেলিল!

তখন বাতাস বলিল, 'দুখু, কাঁদিস নে, আমার সঙ্গে আয়, তোকে তুলা দেব।' দুখু কাঁদিতে কাঁদিতে বাতাসের পিছু পিছু গেল।

যাইতে যাইতে পথে এক গাই দুখুকে ডাকে, 'দুখু, কোথা যাচ্ছ—আমার গোয়ালটা কাড়িয়া দিয়া যাবে?' দুখু চোখের জল মুছিয়া, গাইয়ের গোয়াল কাড়িল, খড়-জল দিল; দিয়া আবার বাতাসের পিছু চলিল।

খানিক দূর যাইতেই এক কলাগাছ বলিল, 'দুখু, কোথা যাচ্ছ—আমায় বড় লতাপাতায় ঘিরিয়াছে, এগুলিকে টেনে দিয়ে যাবে?' দুখু একটু থামিয়া কলাগাছের লতাপাতা ছিঁড়িয়া দিল।

আবার খানিক দূর যাইতে, এক শেওড়া গাছ ডাকিল, 'দুখু কোথা যাচ্ছ—আমার গুড়িটায় বড় জঞ্জাল, ঝাড় দিয়া যাবে?' দুখু শেওড়ার গুঁড়ি ঝাড় দিল, তলার পাতাকুটা কুড়াইয়া ফেলিল। সব ফিটফাট করিয়া দিয়া, আবার দুখু বাতাসের সঙ্গে চলিল।

একটু দূরেই এক ঘোড়া বলিল, 'দুখু দুখু, কোথা যাচ্ছ—আমাকে চারগোছা ঘাস দিয়া যাবে?' দুখু ঘোড়ার ঘাস দিল। তারপর চলিতে চলিতে দুখু বাতাসের সঙ্গে কোথায় দিয়া কোথায় দিয়া এক ধবধবে বাড়িতে গিয়া উপস্থিত!

বাড়িতে আর কেউ নাই; ফিটফাট ঘরদোর, ঝকঝক আঙিনা, কেবল দাওয়ার উপরে এক বুড়ি বসিয়া বসিয়া সূতা কাটিতেছে, সেই সূতায় চক্ষের পলকে পলকে জোড়ায় জোড়ায় শাড়ি হইতেছে।

বুড়ি আর কেউ না, চাঁদের মা বুড়ি! বাতাস বলিল, 'দুখু, বুড়ির কাছে গিয়া তুলা চাও, পাবে।' দুখু গিয়া বুড়ির পায়ে টিপ করিয়া প্রণাম করিল, বলিল, 'দ্যাখ তো আয়ীমা, বাতাস আমার সবগুলো তুলা নিয়া আসিয়াছে—মা আমায় বকবে আয়ীমা, আমার তুলোগুলো দিয়ে দাও।'

চুলগুলো যেন দুধের ফেনা, চাঁদের আলো; সেই চুল সরাইয়া চোখ তুলিয়া চাঁদের মা বুড়ি দেখে ছোট্টখাট্ট মেয়েটি—চিনি হেন মিষ্টি-মধুর বুলি। বুড়ি বলিল, 'আহা সোনার চাঁদ বেঁচে থাক্, ও-ঘরে গামছা আছে, ও-ঘরে কাপড় আছে, ও-ঘরে তেল আছে, ঐ পুকুরে গিয়া দুটো ডুব দিয়ে এসো; এসে ও-ঘরে গিয়া আগে চাট্টি খাও, তারপরে তুলো দেব এখন।'

ঘরে গিয়া দুখু—কত কত ভালো গামছা-কাপড় দেখে—তা সব ঠেলিয়া ফেলিয়া, যা-তা ছেঁড়া নাতা গামছা-কাপড় নিয়া, যেমন-তেমন একটু তেল মাথায় ছোঁয়াইয়া, এক চিমটি ক্ষার-খৈল নিয়া নাইতে গেল।

ক্ষার-খৈলটুকু মাখিয়া জলে নামিয়া দুখু ডুব দিল। ডুব দিতেই এক ডুবে দুখুর সৌন্দর্য উথলে পড়ে! সে কী রূপ! অত রূপ দেবকন্যারও নাই! দুখু তা জানিতেও পারিল না। আর একডুবে দুখুর গয়না—গায়ে ধরে না, পায়ে ধরে না। সোনাঢাকা অঙ্গ নিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া দুখু খাবারঘরে গেল।

খাবারঘরে কত জিনিশ, দুখু কি জানে? জন্মেও অতসব দেখে নাই। এককোণে বসিয়া দুখু চারটি পান্তা খাইয়া আসিল। চাঁদের মা বুড়ি বলিল, 'আমার সোনার বাছা এসেছিস! ঐ ঘরে যা, পেটরায় তুলা আছে, নাও গে!'

দুখু গিয়া দেখিল, পেটরার উপর পেটরা—ছোট বড়, ক-ত রকমের! দুখু একপাশের ছোট্ট এতটুকু এক খেলনা-পেটরা নিয়া বুড়ির কাছে দিল। বুড়ি বলিল, 'আমার মানিক ধন! আমার কাছে কেন, এখন মার বাছা মার কাছে যাও—এই পেটরায় তুলা দিয়াছি।' বুড়ির পায়ের ধূলা নিয়া পেটরা-কাঁখে, রূপে, গয়নায়, পথঘাট আলো করিয়া দুখু বাড়ি চলিল।

দুখু

পথে ঘোড়া বলিল, 'দুখু, দুখু, এস এস, আর কী দিব, এই নাও।' ঘোড়া খুব তেজি এক পক্ষিরাজ বাচ্চা দিল।

শেওড়া গাছ বলিল, 'দুখু, দুখু, এস এস, আর কী দিব, এই নাও।' শেওড়া গাছ এক ঘড়া মোহর দিল।

কলাগাছ বলিল, 'দুখু, দুখু এস এস, আর কী দিব, এই নাও।' কলাগাছ মস্ত এক ছড়া সোনার কলা দিল।

গাই বলিল, 'দুখু, দুখু, এস এস, আর কী দিব, এই নাও।' গাই এক কপিলা-লক্ষণ বকনা দিল।

ঘোড়ার বাচ্চার পিঠে ঘড়া, ছড়া তুলিয়া বকনা নিয়া দুখু বাড়ি আসিল।

'দুখু, দুখু, ও পোড়ারমুখী—তুলা নিয়া কোথায় গেলি?'—ডাকিয়া, ডুকিয়া, আনাচ-কানাচ, খানা-জঙ্গল খুঁজিয়া, মেয়ে না পাইয়া দুখুর মা অস্থির—দুখুর মা ছুটিয়া আসিল—'ও মা, মা আমার, এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?' আসিয়া দেখে—'ও মা! এ কী অন্ধের নড়ি দুঃখিনীর মেয়ে—এসব তুই কোথায় পেলি!' মা গিয়া দুখুকে বুকে নিল।

মাকে দুখু সব কথা বলিল; শুনিয়া দুখুর মা মনের আনন্দে দুখুকে নিয়া সুখুর মার কাছে গেল—'দিদি, দিদি,—ও সুখু, সুখু, আমাদের দুঃখ ঘুচেছে, চাঁদের মা বুড়ি দুখুকে এইসব দিয়াছে। সুখু কতক নাও, দুখুর কতক থাক্।'

চোখ টানিয়া, মুখ বাঁকাইয়া—তিন ঝাকনা ভিরকুট্টি, সুখুর মা বলিল, 'বালাই! পরের কড়ির ভাগ-বাটারি—তার কপালে খ্যাংরা মারি! তেমন পোদ্দারি সুখুর মা করে না! ছাই-নাতা, আগর-বাগর তোরাই নিয়া ধুইয়া খা।' মনে মনে সুখুর মা বিড়বিড়—'শত্তুরের কপালে আগুন—কেন আমার সুখু কি জলে-ভাসা মেয়ে? দরদ দেখে মরে যাই! কপালে থাকে তো, সুখু আমার কালই আপনি ইন্দ্রের ঐশ্বর্য লুটে আনবে।' মুখ খাইয়া দুখু, দুখুর মা ফিরিয়া আসিল।

রাত্রে পেটরা খুলিতেই দুখুর রাজপুত্র-বর বাহির হইল। রাজপুত্র-বর ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়, কপিলার দুধে আঁচায়—দুখু, দুখুর মা'র ঘর-কুঁড়ে আলো হইয়া গেল।

২

রা নাই, শব্দ নাই, সুখুর মা সামনের দুয়ারে খিল দিয়াছে। পরদিন সুখুর মা পিছন দুয়ারে তুলা রোদে দিয়া পিসপিস ফিসফিস সুখুকে বসাইয়া ক্ষার কাপড়ে পুঁটলি বাঁধিয়া ঘাটে গেল।

কতক্ষণ পর বাতাস আসিয়া সুখুর তুলা উড়াইয়া নেয়—কুটিকুটি সুখু—বাতাসের পিছু পিছু ছুটিল!

সেই গাই ডাকিল—'সুখু, কোথা যাচ্ছ শুনে যাও।' সুখু ফিরিয়াও দেখিল না। কলাগাছ, শেওড়া গাছ, ঘোড়া সকলেই ডাকিল, সুখু কাহারও কথা কানে তুলিল না। সুখু আরো রাগিয়া গিয়া গালি পাড়ে—'উঁ! আমি যাব চাঁদের মা বুড়ির বাড়ি, তোমাদের কথা শুনতে বসি!'

বাতাসের সাথে সাথে সুখু চাঁদের মা বুড়ির বাড়ি গেল। গিয়াই—'ও বুড়ি, বুড়ি, বসে বসে কী কচ্ছিস? আমায় আগে সব জিনিস দিয়ে নে, তারপর সুতো কাটিস হুঁ! উনুনমুখি দুখু, তাকেই আবার এতসব দিয়েছেন!' বলিয়া, সুখু বুড়ির চরকা মরকা টানিয়া ভাঙে আর কী!

চাঁদের মা বুড়ি অবাক —'রাখ রাখ—ওমা! এতটুকু মেয়ে তার কাঠ কাঠ কথা, উড়ুনচণ্ডে কাণ্ড।' বুড়ি চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল, আচ্ছা নেয়ে খেয়ে নে, তারপর সব পাবি।'

বলতে সয় না, সুখু দুড়দাড় এ-ঘর থেকে সব্বার ভালো গামছাখানা, ও-ঘর থেকে সব্বার ভালো শাড়িখানা, সুবাস তেলের হাঁড়ি, চন্দনের বাটি যত কিছু নিয়া ঘাটে গেল।

সাতবার করিয়া তেল মাখে, সাতবার করিয়া মাথা ঘষে, ফিরিয়া ফিরিয়া যায়—সাতবার করিয়া আরশি ধরিয়া মুখ দেখে—তবু সুখুর মনের মতো হয় না। তিন প্রহর ধরিয়া এইরকম করিয়া শেষে সুখু জলে নামিল।

এক ডুবে সৌন্দর্য! এক ডুবে গহনা!! আহ্!! সুখুকে পায় কে? সুখু এদিকে চায়, সুখু ওদিকে চায়—'যত যত ডুব দিব, না জানি আরো কী পাব!!

'আঁই—আঁই—আঁই!!!'—তিন ডুব দিয়া উঠিয়া সুখু দেখে—গা-ভরা আঁচিল, ঘা পাঁচড়া—এ—ই নখ, শোনের গোছা চুল—কত কদর্য সুখুর কপালে!—ওঁ মাঁ, মাঁ গোঁ!—কী হঁল গোঁ—কাঁদিতে কাঁদিতে সুখু বুড়ির কাছে গেল।

দেখিয়া বুড়ি বলিল, 'আহা আহা ছাইকপালি—তিন ডুব দিয়াছিলি বুঝি? যা, কাঁদিসনে যা—বেলা বয়ে গেছে, খেয়েদেয়ে নে!' বুড়িকে গালি পাড়িতে পাড়িতে সুখু, খাবারঘরে গিয়া পায়েশ পিঠা ভালো ভালো সব খাবার খাবলে খাবলে খাইয়া ছড়াইয়া হাতমুখ ধুইয়া আসিল—'আচ্ছা বুড়ি, মাঁর কাঁছে আঁগে যাঁই! দেঁ তুঁই পেঁটরা দিঁবি কিঁনা দেঁ।

বুড়ি পেটরার ঘর দেখাইয়া দিল। য-ত বড় পারিল, এ-ই মস্ত এক পেটরা মাথায় করিয়া সুখু বিড়বিড় করিয়া বুড়ির মুণ্ডু খাইতে খাইতে রূপে দিক চমকাইয়া বাড়ি চলিল!

সুখুর রূপ দেখিয়া শিয়াল পালায়, পথের মানুষ মূর্ছা যায়।

পথে ঘোড়া এক লাথি মারিল; সুখু করে—'আঁই আঁই'! শেওড়া গাছের এক ডাল মটাশ করিয়া ভাঙিয়া পড়িল, সুখু করে—'মঁলাম! মঁলাম!' কলাগাছের এক কাঁদি কলা ছিঁড়িয়া পিঠে পড়িল; সুখু বলে—'গেঁলাম! গেঁলাম!' শিং বাঁকা করিয়া গাই তাড়া করিল, ছুটিতে ছুটিতে হাঁপাইয়া আসিয়া সুখু বাড়িতে উঠিল।

দুয়ারে আলপনা দিয়া, ঘট পল্লব নিয়া জোড়া পিঁড়ি সাজাইয়া সুখুর মা বসিয়াছিল। বারে বারে পথ চায়। সুখুকে দেখিয়া, সুখুর মা—

'ও মা! মা!! ও মা গো কী হবে গো!
কোথায় যাব গো!'

চোখের তারা কপালে, আছাড় খাইয়া পড়িয়া সুখুর মা মূর্ছা গেল। উঠিয়া সুখুর মা বলে, 'হোক হোক অভাগী, পেটরা নিয়ে ঘরে তোল্; দ্যাখ আগে, বর এলে বা সব ভালো হইবে!'

দুইজনে পেটরা নিয়া ঘরে তুলিল।

রাত্রে পেটরা খুলিয়া সুখুর বর বাহির হইল! সুখু বলে, 'মা, পা কেন কন্ কন্?'

মা বলিল,—'মল পর।'

সুখু—'মা, গা কেন ছন্ ছন্?'

মা—'মা, গয়না পর।'

তারপর সুখুর হাত কটকট, গলা ঘড়ঘড়, মাথা কচকচ ক-ত করিল—সুখু হার পরিল, নথ-নোলক, সিঁথি পরিয়া টরিয়া সুখু চুপ করিল। মনের আনন্দে সুখুর মা ঘুমাইতে গেল।

পরদিন সকালে সুখু আর দোর খোলে না—'কেন লো, কত বেলা, উঠবি না?'

নাহ্, নাওয়ার-খাওয়ার বেলা হইল, সুখু উঠে না। সুখুর মা গিয়া কবাট খুলিল। 'ও মা রে মা!' সুখু নাই, সুখুর চিহ্ন নাই—ঘরের মেঝেতে হাড়গোড়, অজগরের খোলস! অজগরে সুখুকে খাইয়া গিয়াছে!

চেলাকাঠ মাথায় মারিয়া সুখুর মা মরিয়া গেল।

হলেন বনগামী

ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী

১

একে যে ছিল ব্রাহ্মণী, আর তার যে ছিল পতি—ব্রাহ্মণীটি বুদ্ধির ঘড়া, ব্রাহ্মণ বোকা অতি।

কাজেই সংসারের যত কাজ ব্রাহ্মণীরই হত করতে; ব্রাহ্মণ শুধু খেতেন বসে, ব্রাহ্মণীর হত মরতে। ব্রাহ্মণীটি যে—রণচণ্ডী! নথের ঝাঁকিতে নাক ছিঁড়ে। মাথার চুলে তৈল নাই, গা-গতরে খৈল নাই, 'নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা' তার উপর আবার বামুনের চাটাল চাটাল কথা। জ্বালাতন-পালাতন বামনী ধান ঝাড়ে, তার তুষ ফেলে, কি ধান ফেলে!

এমন সময় ব্রাহ্মণ গিয়া বলিল, 'বামনী, আজ বুঝি পিঠে করবি, না?'

কুলো মুলো ফেলিয়া খ্যাংরা নিয়া ব্রাহ্মণী গর্জে উঠিল—'হ্যাঁ, পিঠে করতেই বসেছি! চাল বাড়ন্ত হাঁড়ি খট খট —এক কড়ার মুরোদ নাই পিঠা-খেকোর পুত পিঠা খাবে! বেরো আমার বাড়ি থেকে!'

গর্জনে উঠান কাঁপে, গাছ থরথর পক্ষী উড়ে; ব্রাহ্মণ ভাবলেন—

'কী? ব্রাহ্মণী, তার গালি সইব এত আমি?
তা হবে না।'
তখনি রাগে হলেন বনগামী!

২

বনে বনে ঘোরেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা। সকল কথা শুনিয়া, সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে আপন আশ্রমে নিয়া গেলেন।

আশ্রমে গিয়া ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর কাছে লেখাপড়া শিখেন।

কান নড়বড়, বুড়ো বামুন
মুনির কাছে পড়েন কেমন?

এ বেলা পড়েন : 'ক—চ—প—অ-অ-অ-'
ও বেলা পড়েন : 'খ—চ—ফ—অ- অ-অ!'
দিনে পড়েন : 'হগড়ং ডগড়ং বগ বগ বগ বগড়ম!'
রাতে পড়েন : 'চং, ছুং, খঁরঁরঁঅম—ঘড়-ড় ঘড়ম!'

নাকের ডাকে, গলার ডাকে নিশি ভোর!

এইরকম করিয়া ব্রাহ্মণ খুব অনেক বিদ্যা শিখিয়া ফেলিলেন! শিখিয়া-শুখিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবলেন—আমি হনু একজন!

বিদ্যেয় এখন ছড়াছড়ি যাবে যশ ধন!
তখন—বামনীর সে বিষমুখ দেখতে না আর হবে—
হাঃ! হাঃ!
তখন আমি কোথায় রব, আর বামনী কোথা রবে!

ভারি স্ফূর্তি! কিসের আবার সন্ন্যাসীর কাছে বলা টলা!

খুঙ্গি পুঁথি লাঠি চাটি বাঁধিয়া পুঁটুলি
'জয় জগদম্বা!' বামুন দেশে গেলেন চলি।

৩

ভাদ্দুরে রোদ, তাল পাকে, মাটি পাথর ফাটে—সন্ধ্যাবেলায় ব্রাহ্মণ আপন গাঁয়ের সীমায় আসিলেন।—'ঠিক তো! রাজার বাড়ি তো যাবই তো; তা মরিল কি রইল, বামনীটাকে একবার দেখে গেলেও— হয়।'

একটু রাত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণ বাড়ির আঙিনায় উঠিয়াছেন।

ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ বামুন, শুনতে পেলেন কানে—
বামনী ভাজেন তালের বড়া, বুঝি অনুমানে!'

ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া কানাচে কান পাতিয়া রহিলেন।

'কটা হল ছ্যাঁক?—মনে মনে ল্যাখ।
চার, পাঁচ, সাত, আট—এক কুড়ি এক।'

তখন আর 'ছ্যাঁক' নাই—ব্রাহ্মণী হাত-পা ধুইয়া যেই বাহিরে আসিলেন—

ব্রাহ্মণ ডাকিলা উচ্চে—'ব্রাহ্মণী আছ বাড়ি?
এবার আমি শিখে এলাম বিদ্যে ভারি ভারি!'

চমকিয়া ব্রাহ্মণী ছুটিয়া আসিয়া দেখেন—সারা-অঙ্গে তিলক-ফোঁটা ব্রাহ্মণ আসিয়া হাজির! ব্যস্তে-স্বস্তে ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'এতদিন কোথায় ছিলে?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'ব্রাহ্মণী! আমি খুব ভারি ভারি বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছি, তাই তোকে বলিয়া যাইতে আসিয়াছি।'

ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'দূর পাগল!'

ব্রাহ্মণ বলিলেন :

'জানিসনে তাই বলছিস অমন, নইলে এতক্ষণ
এককুড়ি এক বড়া সাজিয়ে দিতিস নেমন্তন।'
—'অ্যা? তুমি কী করে জানিলে?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'বামনী!—

ঐ তো বিদ্যের মা জননী! বললেম আমি গণে—
যেখানে যে ভাজুক বড়া সবি আমার মনে।'

শুনিয়া ব্রাহ্মণী অবাক !—'আহা, আহা, সত্যি কি, সত্যি কি ?' ব্রাহ্মণী মনের আনন্দে—

ছুটে গিয়ে যত পাড়ার লোকের কাছে কয়—
'বামুন এল বিদ্যে শিখে, যেমন বিদ্যে নয়।'

পাড়ার লোকে আশ্চর্য ! আসিয়া দেখে—

মেলাই পুঁথি খুলে বামুন ঘন টিকি নাড়ে,
হং লং বং চং লম্বা বচন ঝাড়ে—

সেসব কি যে-সে বোঝে ? সকলের চমক লাগিয়া গেল !

দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র হল যে,
চমৎকার বিদ্যে বামুন শিখে এসেছে।

৪

খুব জাঁকে দিন যায়। এর হাত গণেন, ওর চুরি গণেন, দেশে দেশে ব্রাহ্মণের বিদ্যার নামে জয়-জয় উঠিল।

একদিন মতি ধোপার গাধা হারাইয়াছে। মতি ব্রাহ্মণের দুয়ারে আসিয়া ধরনা দিল—

'বলে দাও দেবতা আমার উপায় হবে কী গো—
সবে ধন হারিয়েছি খোঁড়া গাধাটি গো।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন :

'চুপ থাক্, এখন আমি চণ্ডীপুজো করে
তবে এসে বলব বসে থাকগে ওই দোরে।'

না খাইয়া, না দাইয়া মতি দুয়ারে পড়িয়া রহিল।

ব্রাহ্মণ ঘরে গিয়া বলেন, 'বামনী এখন কী করি ? দাও তো দেখি ছাতাটা।'

ছাতা নিয়া ব্রাহ্মণ ঝাঁঝাঁ রৌদ্রে সারা মাঠ ঘুরিয়াও গাধা পাইলেন না। তখন,

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে, ক্ষুণ্ন অতি মন—
বলিলেন, 'ওরে মতে ! বলি তোরে শোন্—
আজ গাধাটা পাবি নাকো—যা,
চণ্ডী রেগেছেন বড় কী জানি কী করে
কাল এসে গাধা তুই নিয়ে যাস ঘরে।'

দেবীর রাগের কথায় মতি
ভয়ে ভয়ে চলে গেল।
তখন সূয্যি ডুবে গেছে,
তারপর রাত্রি হয়ে এল।
ব্রাহ্মণের চিন্তা বড়—
'বুঝি এইবার
হায় হায় ভেঙে যায় সব ভুরিভাড়।'

রাত্রি হইল, বসিয়া বসিয়া মাথে হাত ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন—

'যত বিদ্যা খুঙ্গি পুঁথি এবার ফাঁক
জগদম্বা ! কী করিলে ! বিষম বিপাক !'

ভাবিয়া ভাবিয়া ব্রাহ্মণ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

অনেক রাত্রে, বার-আঙিনার কোণে কিসের শব্দ ! ব্রাহ্মণ ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিলেন—

'বামনী বামনী শুনেছ—ওটা হল কিসের শব্দ ?'

ব্রাহ্মণী—

'হাঁ হাঁ —বুঝি চোর এসেছে—করতে হবে জব্দ।'

ব্রাহ্মণটি আবার চোরের নামে ভয় খেতেন; কাঁদো-কাঁদো সুরে বলিলেন, 'বামনী, তবে আমি নুকুই !'

ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'তাই তো ! এতেই এতবড় পণ্ডিত? অত পণ্ডিতি ঢলাইয়া কাজ নাই, আমি আলো ধরছি, চোর ধরবে চল—

পরের চোর গণে নিত্য বেড়ান বাড়ি বাড়ি,
আপন ঘরে সেঁধোলে চোর, করেন তড়বড়ি।'

কী করেন বামুন—'জারে লোহা কোঁকড়' ডরে ভয়ে কেন্নটি; ঘরে থাকলে রাবণে মারে, বাইরে গেলে রামে মারে—দশ আঙুল পৈতা জড়াইয়া 'দুর্গা—দুর্গা—জগদম্বা' জপিতে জপিতে ব্রাহ্মণ চোর ধরিতে গেলেন।

'ঐ যে চোর, ধর না !' ধাক্কা দিয়া বামনী বামুনকে ঠেলিয়া দিল !—

'গ্যা—গ্যাঁ—গ্যাঁ ঘ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ।'

'ওমা ! ও আবার কী !'

প্রদীপ নিয়া গিয়া ব্রাহ্মণী দেখেন—

ওমা—এটা তো চোর নয় গো মা—
উবড়ো-থুবড়ো পড়ে আছে মস্ত গাধাটা !

বামুনে-গাধায় ঝড়-কম্পন, কুকুর-কুণ্ডলী !

হুমড়ি খেয়ে যখন বামুন উপরে পড়ল আসি,
গলায়-দড়া খোঁড়া গাধার লেগে গেছে ফাঁসি।

গাধার গলায় ঘড় ঘড়, বামুন করেন ধড়ফড়।

চোখ উল্টে পড়ে বামুন হয়েছে হাঁ।

বামনী উঠলেন চেঁচিয়ে—**'হায় ! কী হল গো মা !'**

পাড়ার লোক ছুটিয়া আসে—'কী , কী, কী হয়েছে—ভয় নাই !'

ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'না না, কিছু না, এই গাধাটা দেখছিলেন।' তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণী গাধা নিয়া খুঁটিতে বাঁধিলেন, বামুনকে নিয়া বিছানায় শোয়াইলেন—তেল, জল, ফুঁ বাতাস—সকলে আসিয়া বলে, 'কী, কী, হইয়াছে কী?'

ব্রাহ্মণী বলিলেন—

'এমন কিছু না—ঠাকুর বসেছিলেন জপে,
গণে এনে মতির গাধা এই শুয়েছেন তবে।
হারানো গাধা গণে আনা শক্ত কম তো নয় !—
তাই একটু অস্থির আছেন জ্যোতিষ মহাশয়।'

কী আশ্চর্য ! মন্ত্রের জোরে হারানো গাধা আসিয়া উপস্থিত !

সকলে অবাক ! ! !

এত তেল জল বাতাস ! মূর্ছা ভাঙতেই—'চোর ! চোর !' বলে বামুন উঠিয়া বসিল ! ব্রাহ্মণী বলিলেন—

'চোর কোথায় তোমার মাথা—
ওই দ্যাখ না মতির গাধা খুঁটিতে বাঁধা।'

ব্রাহ্মণ বলিল, 'গাধা?—কই কই মতে'কে ডাকো !'

তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণী বলেন, 'চুপ কর, চুপ কর—এত রাত্রে মতে'? ওগো বাছারা, রাত গেল, তোমরা এখন বাড়ি যাও,—বামুন ঘুমুক।' সকলে চলে গেল। বামুন জিজ্ঞাসেন, 'তাই তো বামনী, হয়েছিল কী !'

পরদিন মতি আসিয়া দেখে—গাধা! মতি লম্বা গড়াগড়ি—আঙিনার অর্ধেক ধুলাই মতি খাইয়া ফেলিল!

এখন অমনি বামুনের কাপড় কাচে—তারপর মতি —

এ আশ্চর্য কথা আরো ঘটা ছটা দিয়ে—
রটনা করিল সব গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে।

তখন—

ব্রাহ্মণের ধন্য প'ল দেশময়।—
ক্রমে এ কাহিনী রাজ-কর্ণগোচর হয়।

৫

রাজকন্যার লক্ষ টাকার হার পাওয়া যায় না। কত জ্যোতিষ, কত পণ্ডিত আসিয়া হার মানিল। 'রুই কাতলার আটকাট, সবই কেবল মালসাট।'—শেষে ডাকো বামুনকে।

ঢেঙা ঢেঙা পাইক, এ-ই এ-ই আশা-সোটা! বামুন ভাবেন 'ভালো ভালো ছিলাম বোকা, কপালের না জানি লেখা'—খাঁড়ার তলে ধাড়ি ছাগল, কাঁপিতে কাঁপিতে বামুন রাজসভায় গেলেন।

রাজার হুকুম—

'হার গণে দিতে পার পাবে পুরস্কার,
নইলে বামুন শেষকালে বাস কারাগার।'

সিধা পত্র চুলোয় যাক, পূজা অর্চনা মাথায় থাক, ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মহারাজ, দুদিন সময় চাই।'

'আচ্ছা!'

দিনের মতোন দিন গেল, রাত এল,

এক ঘরে বামুনের ঠাঁই
ঘটি ঘটি জল খায় বামুন করে আই ঢাই—
'হায় মাগো জগদম্বা, বিপাকে ফেলিলি,
ছায়ে পোয়ে সর্বনাশ, প্রাণে-ধনে নিলি
কী করি উপায় মাগো, কী করি উপায়—
জগদম্বা! এই তোর মনে ছিল হায়!'

রাজবাড়ির জগা মালিনী, জগদম্বা নাম—

সেইখান দিয়া যাচ্ছিল—
খপ্ করে থামে জগা—ধুকু ধুকু প্রাণ।

আর কথা, আর বার্তা—'দোহাই ঠাকুর, দোহাই বাবা! যা বল বাবা তা-ই করি—রাজার কাছে যেন আমার নামটি করো না!' জগা ছুটিয়া গিয়া বামুনের দুই পা সাপটিয়া পড়িল।

বামুন চমৎকার!—এ আবার কী!—"কে তুমি, কে তুমি! আমি কী করেছি—আমাকে কেন?'

'না বাবাঠাকুর, তুমি সব জেনেছ, আমি আর এমন কর্ম করব না—দোহাই বাবা, আমাকে রক্ষা কর, লোভে পড়ে আমি রাজকন্যার হার নিয়েছিলাম। দোহাই বাবা, পায়ে তোর পড়ি বাবা!'

তখন বুঝিল ব্রাহ্মণ, কী করে কী হল—
জগদম্বা নাম নিতে জগা ধরা দিল!

তখন, ব্রাহ্মণের ধড়ে এল প্রাণ—ধীর সুস্থির মহাপণ্ডিত হইয়া বলিলেন, 'যা করেছিস, করেছিস, তোর ভয় নাই, হাঁড়ির ভিতর যেমন হার থাকে; রাখ নিয়া খিড়কি পুকুরের পাঁকে; তাতে যেন ভুলটি না হয়।'

দুই চক্ষের জল ছেড়ে, জগা বাঁচে—তখনি হার নিয়া খিড়কি পুকুরে রাখিয়া আসিল।

পরদিন—গা-ময় তিলক ছাপা চিতাবাঘের ঠাকুর-জামাই, তিন নামাবলি গায়, তিন নামাবলি গলায়, বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, ফুলের ভারে টিকি ঝোলা; খুঙ্গি, পুঁথি, ছাতি, লাঠি সকল নিয়া

ব্রাহ্মণ রাজার সভায় গিয়া উপস্থিত।

টিকি নাড়ে মন্ত্র পড়ে, ভঙ্গি ছঙ্গি কত
এ পুঁথি ও পুঁথি খোলে পুঁথি শত শত!

গণিয়া গণিয়া আঙুল ক্ষয়—কত শত খড়ি পাতে, কত শত মাটি আঁকে— অনেক ক্ষণের পর—

'শুন শুন মহাশয়! পেয়ে গেছি হার,
নিশ্চয় সে রহিয়াছে পুকুরে তোমার।'

'খোজ খোঁজ!'—পুকুরের জল দৈ—কিন্তু হার মিলিল কৈ?

রাজা বলিলেন—

'হা রে হা রে, চতুরালি করেছ বচন,
না রাখো প্রাণের ভয়, কেমন ব্রাহ্মণ!'

'দোহাই মহারাজ!'—ভ্যাঁ করে বামুন কাঁদে আর কী— 'আমার ভুল নাই—মহারাজ, তবে সত্যি এ-সব জগদম্বার কাজ!

রাজা বলিলেন, 'ঠিক! হতে পারে দশার দশা, আচ্ছা, নাহয় আবার খোঁজ! তা, বামুনকে বাঁধ, যেন না পালায়!'

আবার খোজ খোঁজ—

কাদার তলেতে এক পাওয়া গেল ভাঁড়;
ভেঙে দেখে, ঝলমল হার মাঝে তার।

পাওয়া গেল, পাওয়া গেল! বামুনের বাঁধ খুলে গেল—

সিংহাসন ছেড়ে রাজা পড়ে সে পায়—
'আজ হতে হইলা তুমি পণ্ডিত সভায়।'

আনন্দে ব্রাহ্মণ মূর্ছা-ই গেল। এবার কিন্তু সে চোর ধরার মূর্ছা নয়। তা না হোক, তা ভালোই— তারপর? তারপর?

ধন রত্ন মণি মোতি, ছড়াছড়ি যায়
নিত্য গিয়া বসে ব্রাহ্মণ রাজার সভায়।
দিকে দিকে হতে আসে পণ্ডিত বড় বড়,
আমাদের পণ্ডিতের নামে ভয়ে জড়সড়।
রাজা দেন পাদ্য-অর্ঘ্য, রানি দেন পূজা,
জগা নিত্য জোগায় ফুল—
ঠাকুর পূজেন দশভুজা।

তখন —

ত্রিতল প্রাসাদে সেই আগের ব্রাহ্মণ
সোনার খাটেতে রন করিয়া শয়ন।

আর —

তেলে ভাণ্ডার ভেসে যায়, গায়ে ধরে না গয়না,
ব্রাহ্মণী তো ভারি খুশি—হেসে ছাড়া কয়-ই না।

এখন —

রোজই বামুন পিঠা খায়—
'আহা লক্ষ্মী অতি।'

শুনে বামনি হেসে কুটি কুটি—মনের সুখে—
পতিসেবা করিতে লাগিলা সুখে সতী।

খুনখুনে বুড়ি

দেড় আঙুলে

১

একা কাঠুরিয়া। ছেলে হয় না, পিলে হয় না, সকলে 'আঁটকুড়ে আঁটকুড়ে' বলিয়া গালি দেয়, কাঠুরিয়া মনের দুঃখে থাকে। কাঠুরিয়া-বউ আচারনিয়ম ব্রত উপোস করে, মা-ষষ্ঠীর-তলায় হত্যা দেয়— 'জন্মে অন্মে,কত পাপই অর্জে ছিলাম মা, কাচ্চা হোক বাচ্চা হোক অভাগীর কোলে, একটা কিছু দে মা, ভিটে বাতির নিদর্শন থাক্।'

কাঁদিতে কাঁদিতে—মা ষষ্ঠী এক রাতে স্বপন দিলেন—'উঠ লো উঠ,

তেল সিঁদুরে নাবি ধুবি। শশা পাবি শশা খাবি।
কোলে পাবি সোনার পুত বুকজুড়ানো মানিকটুক।'

কাঁচা পোয়াতির ঘুম ভাঙে নাই, কাকপক্ষী মাটি ছোঁয় নাই, ভোর জোছনায়, এক কপাল সিঁদুর আঁজলপুরা তেল মাথায় দিয়া কাঠুরে-বউ ষষ্ঠীমা'র ঘাটে নাইয়া ধুইয়া ডুব দিয়া আসিল।

আদেশ হইয়াছে, আর কী! 'শশা যদি পাস শশা খাস' বলিয়া মনের আনন্দে কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতে বনে গেল।

বনে ঝরনার পাড়ে একশ বচ্ছুরে খুনখুনে এক একরত্তি বুড়ি! 'কে বাছা, আঁটকুড়ে কাঠুরিয়া? চক্ষেও দেখি না, মক্ষেও দেখি না ছাই—এই নে বাছা, এইটে গিয়ে বউকে দিস, কিচ্ছু যেন ফেলে না, সাতদিন পরে যেন খায়, চাঁদপানা টলটল হাতি-হেন ছেলেটা—কোলজোড়া—ঘর আলো করবে।' এতটুকু এক থলে খুলিয়া ছোট্ট এক শশা কাঠুরের হাতে দিয়া গুটিগুটি বুড়ি বনের মধ্যে চলিয়া গেল।

আর কাঠ কাটা! একে দৌড়ে কাঠুরিয়া বাড়ি— 'ও অভাগী আঁটকুড়ি! এই দ্যাখ্, এই নে হাতে-পাতে মা-ষষ্ঠীর বর! আজ যেন খাস নি, সিকায় তুলে রাখ্, সাতদিন পরে খাবি।' মনের

আহ্লাদে তিন খাবল তেল মাথায় দিয়া কাঠুরিয়া নাইতে গেল। কিছু যে ফেলিতে মানা, মনের ভুলে কাঠুরিয়া তা বলিয়া গেল না।

'সাতদিন না সাতদিন!' মা-ষষ্ঠী বলেছেন, 'শশা পাবি শশা খাবি।' হাতে পায়ে জল দিয়া 'মা-ষষ্ঠী, মা-ষষ্ঠী' নাম নিয়া, কাঠুরে-বউ বোঁটা-সোটা ফেলিয়া কপালে কণ্ঠায় ছোঁয়াইয়া কুচমুচ শশাটি খাইয়া ফেলিল।

নাইয়া-দাইয়া আসিয়া কাঠুরিয়া দাওয়ায় খাইতে বসিবে, দেখে শশার বোঁটাটা!— 'ও সর্বনাশী! শশা তো খাইয়াছে! আ অভাগী কুলোকানি! করেছিস কী রাক্ষসী!—খেলি তো খেলি, বোঁটা কেন ফেললি! শিগগির তুলে খা!'

'ওমা—কী হয়েছে?' থতমত কাঠুরে-বউ বোঁটা তুলিয়া খাইল। গালে-মাথায় চাপড় দিয়া কাঠুরিয়া ভাতের থাল ছুড়িয়া ফেলিল।

২

আর কিসে কী! এত ধরনা, এত করনা— কাঠুরে-বউর যে ছেলে হইল—ও মা! 'জন্মিতে জন্মিতে বুড়ির চুল দাড়ি আঠারো কুড়ি। এক দেড় আঙুলে ছেলে, তার তিন আঙুলে টিকি!'

দেড় আঙুল

'না বলতে শশা খেলি, বুড়ির শাপে পাতাল গেলি!' দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া রাগিয়া মাগিয়া দড়িকুড়াল নিয়া কাঠুরিয়া একদিকে চলিয়া যায়! 'সাত দিন পরে খাইলে হাতির মতোন ছেলে হইত, বোঁটাটা হাতির শুঁড় হইত! তা নয়—হয়েছেন এক টিকটিকি—বোঁটা হয়েছেন তিন আঙুলে এক টিকি —এক বিঘত ধানের চৌদ্দ বিঘত চাল।'

কাঠুরে-বউ তো ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

'ওঙা,ওঙা!' ছেলে কাঁদে, কে নেয় কোলে, কে করে যতন, কাঠুরে তো গেলই, কাঠুরে-বউ নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া মরিতে চলিল—'দিলি দিলি এমন দিলি! মা-ষষ্ঠী, তোর মনে এই ছিল!'

আঙুল চুষিয়া দেড় আঙুলে ছেলে খাড়া হইল! দৌড়িয়া গিয়া তিন আঙুলে টিকি দিয়া মায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'মা, মা, ! যাস নি, আমায় একটু দুধ দে।'

'মা!' জন্মিয়াই ছেলে কথা কয়! সামান্যি তো নয় মা, সামান্যি তো নয়! চোখের জল মুছিয়া 'ষাঠষাঠ' ধুলা ঝাড়িয়া কাঠুরে-বউ ছেলে তুলিয়া কোলে নিল।

পেট ভরিয়া দুধ খাইয়া দেড় আঙুলে বলিল, 'মা, এখন নামিয়ে দে, বাবাকে নিয়ে আসি!'

৩

বাবা কোন্ রাজ্যে কোথায় গেছে, তুরতুর করিয়া দেড় আঙুলে পথঘাট ছাড়ায়। পিঁপড়ে আসে, গুবরে আসে, ফড়িং যায়—দেড় আঙুলের সঙ্গে কেউ পারে না; দেড় আঙুলে হটিং হটিং করিয়া হাঁটে, ফটিং ফটিং করিয়া নাচে! হাঁটিতে হাঁটিতে, নাচিতে নাচিতে এক রাজার বাড়ির কাছে গিয়া দেড় আঙুলে দেখে—ঠা ঠা রৌদ্রে মাথার ঘাম পায়ে, তার বাবা কাঠ কাটিতেছে।

দেড় আঙুলে বলিল, 'বাবা, আমায় ফেলে এলি কেন? বাড়ি চল্। মা কত কাঁদছে।'

কাঠুরে অবাক! ছেলে তো সামান্য নয়! বুকে তুলিয়া চুমা খাইয়া বলিল, 'বাপ আমার সোনা, কী করে যাই, রাজার কাছে আপনা বেচেছি।'

দেড় আঙুলে রাজার কাছে গেল।

'রাজামশাই, রাজামশাই, রাজ-রাজ্যের কাঠ কাটে কে?'

রাজা—'কে রে তুই? কাঠ কাটে অচিন দেশের নচিন কাঠুরে।'

দেড় আঙুলে—'কাঠুরেটি কোথায় থাকে?
কাঠুরেটি দাও না মোকে?'

রাজা—'নিয়ে এল হাটুরে, কড়ি দিয়ে কিনলাম কাঠুরে— ব্যাটা বড় মস্তকী, সেই কাঠুরে তোরে দি।'

দেড় আঙুলে বলিল, 'তবে কী?'

রাজা—'নিয়ে এসে কড়ি, তবে আসিস রাজা-রাজড়ার পুরি।'

শুনিয়া, দেড় আঙুলে গিয়া বলিল, 'বাবা, তুমি কিছু ভেবো না, আমি দেখি, কড়ি আনতে চললাম।'

৪

ভাঁটার মতোন ছোটে, কুতুর কুতুর হাঁটে—একখানে আসিয়া দেড় আঙুলে দেখিল, এক খাল। কেমন করিয়া পার হইবে? বসিয়া বসিয়া দেড় আঙুলে ভাবিতে লাগিল।

পিছনে, টিকিতে ইয়া এক টান! —'হেই দেড় আঙুলে মানুষ, তিন আঙুলে টিকি! তুই কে রে?' টিকির টানে চিৎপটাং, তিন গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া চটিয়া মটিয়া দেড় আঙুলে বলিল, 'আমি যে হই সে হই, তুই বেটা কে রে?'

ব্যাঙ বলিল, **'ব্যাঙ রাজার রাজপুত্তুর রঙ-সুন্দর ব্যাঙ।'**

দেড় আঙুলে বলিল, **'তোর নাক কাটব কান কাটব,**
কাটব দুটো ঠ্যাং।'

ব্যাঙ হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিল—

'টিং টিঙা টিং টিঙা। কাটবি কি তুই ঝিঙা।
নাকও নাই, কানও নাই, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ঘিঙা।'

বলিয়া ব্যাঙ নাচিতে লাগিল। দেড় আঙুলে বড়ই ঠকিয়া গেল।

নাচিয়া নুচিয়া ব্যাঙ বলিল, 'ভাই, তুই কী রে?'

'কাঠুরে।'

'তবে তোর কুড়ুল কই রে।'

'নাই রে!'

'দুয়ো! উতুরে এক কামার আছে, এক কড়া কড়ি দিয়া কুড়ুল নিয়া আয়।'

দেড় আঙুলে বলিল, 'না ভাই, আমি কড়ি কোথায় পাব? কড়ি নাই বলেই তো বাবাকে আনতে পারলেম না। আমি ছোট ছেলেমানুষ, আমার কিছু আছে কি না! তোর থাকে তো ধার দে না ভাই?'

'ও বাবা'—ব্যাঙ চমকিয়া উঠিল—'আমার মোটে কানা এক কড়ি, তাই তোমাকে দি! ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাং!—লাফে লাফে ব্যাঙ চলিয়া যায়।—'তা যদি কুড়ুল আনিস তো—'

দেড় **আঙুলে** বলিল, **'আচ্ছা,** কুড়ুল কোন্ পথে বলিয়া দে।'

'তবে যা!'

পথের কথা বলিয়া দিয়া ব্যাঙ কচুর পাতার নিচে বসিয়া রহিল।

একখানে এক ছোট্ট ঘর, তারি মধ্যে এক আড়াই আঙুলে কামার তিন আঙুল দাড়ি নাড়িয়া এক পৌনে আঙুল কুড়াল আর এক কাস্তে গড়িতেছে।

কড়ি নাই ফড়ি নাই, কী দিয়া কী করে? তা কুড়ুল না নিলেও তো নয়! চুপটি চুপটি, আড়াই আঙুলে কামারের পিছনে গিয়া, দাড়ির সঙ্গে টিকিটি বাঁধিয়া দিয়া দেড় আঙুলে 'চ্যা ম্যাঁ' করিয়া চেঁচাইয়া একলাফে একেবারে আড়াই আঙুলের ঘাড়ে!

'আ—আ আমঃ! রাম রাম—দুগগা —দুগগা!!' বুড়া ছিটকাইয়া উঠিয়া ডরে ঠি ঠি করিয়া

ঠকাঠক

কাঁপে! কী না কী—ভূত না প্রেত!!

হাসিতে হাসিতে পেট ফাটে, হাসিতে হাসিতে গলিয়া পড়ে, নামিয়া আসিয়া দেড় আঙুলে বলিল, 'কামার ভাই, কামার ভাই; ডরিও না, তোমার সঙ্গে মিতালি!'

মিতালি আর ফিতালি—আড়াই আঙুল খুব রাগিয়া গিয়াছে, বলিল, 'কে রে তুই? ঘরে যে উঠিয়াছিস, কড়ি এনেছিস?'

ও বাবা! সকলেই কড়ি!—'সে কী ভাই, কড়া কড়ি আবার কিসের?'

'আমার ঘরে উঠলেই কড়ি!'

'তবে ভাই টিকি খুলিয়া দাও, আমি যাই!'

আড়াই আঙুলে টিকি খুলিতে খুলিতে টিকির এক চুল ছিঁড়িয়া গেল। চোখ রক্ত করিয়া তখন দেড় আঙুলে বলিল, 'এইও বড়! আমার টিকি ছিঁড়লি যে! এইবার কড়ি ফ্যাল্।'

কামার বুড়ো ভ্যাবাচাকা; বলিল, 'অ্যাঁ—অ্যাঁ—তা ভাই, কড়ির বদল কী নিবে নাও।'

তখন দেড় আঙুলে কড়ির বদলে কুড়ুলটি চাহিয়া বলিল, 'আজ থেকে তোমায় আমায় মিতালি।'

কুড়ুল আনিলে ব্যাঙ বলিল, 'ভাই দেড় আঙুলে, আমি ব্যাঙরাজার ব্যাঙ রাজপুত্র, এক কুনোব্যাঙি বিয়ে করেছিলাম, তাই বাবা আমাকে বনবাস দিলেন। আমার কুনোরানি ঐ ভেরেণ্ডা গাছে লাউয়ের খোলসের মধ্যে—তার সঙ্গে আর কিছুই নাই, কেবল এক ঘাসের চাপাটি আর এক সাতনলা আছে। তুমি ভাই গাছটা কাটিয়া আমার কুনোরানিকে পাড়িয়া দাও।'

বলতে-না-বলতে পৌনে আঙুল কুড়ুল ঠকাঠক! দেখিতে দেখিতে হড়মড় করিয়া গাছ পড়িল।

খোলসটি কিনা মস্তবড় উঁচু! হাঁ করিয়া খাড়া হইয়া রহিল! টানিয়া টুনিয়া ব্যাঙ বলিল, 'ভাই, এত করিলে, অত করিলে, সব মিছা!' চক্ষের জলে ব্যাঙের বুক ভাসে।

দেড় আঙুলে বলিল, 'রও!' চটপট ডালের উপর উঠিয়া চিত হইয়া, টিকিটি খোলসের মুখে ঝুলাইয়া দিয়া বলিল—

'কুনোরানি, কুনোরানি জেগে আছ কি?
শক্ত করে ধরে উঠ, সিঁড়ি দিয়েছি।'

টিকি ধরিয়া কুনোরানি উঠিয়া আসিল!

ব্যাঙ বলিল, 'ভাই, আমার কানাকড়িটি নাও। এইটি দিয়ে তোমার বাপকে কিনিয়া নিও।'

কুনোরানি বলিল, 'রাজার জামাই দেড় আঙুলে, আমার এই থুতুটুকু নাও, রাজার কানা রাজকন্যা—ইহাই নিয়া রাজকন্যার কানা চোখ ফুটাইও!'

সাতনলা আর খোলসটি বলিল—

'রাজার জামাই দেড় আঙুলে শাবাশ সিপাহি!
মোদের নাও সাথে করে পাবে রাজার ঝি।'

সব নিয়ে দেড় আঙুলে বলিল, 'এখন ভাই আসি?'

৫

আবার হটিং হটিং, আবার ফটিং ফটিং; রাজার কাছে গিয়া দেড় আঙুলে হাঁক ছাড়িল—

'রাজামাশাই, রাজামশাই, কড়ি গুণে নাও,
আপন কড়ি বুঝ পড়; কাঠুরেটি দাও।'

রাজা কড়ি গুণে, বুঝে নিয়ে—টিকিতে তিন টান, দুই গালে দুই চাপড়, দেড় আঙুলকে খেদাইয়া দিলেন—

'তেরো নদীর পাড়ে আছ সাত চোরের থানা,
তারি কাছে দিব বিয়ে রাজকন্যা কানা।
সেই চোরদিগে আগে নিয়ে এসে, কথা ক।'

দেড় আঙুলে আবার ব্যাঙের কাছে গেল—

'রঙ-সুন্দর রাজপুত্তুর কোথায় আছ ভাই!
তেরো নদী পার হব, দুটো কড়ি চাই।'

ব্যাঙের তখন মেলাই কড়ি; বলিতে-না-বলিতে ব্যাঙ কড়ি আনিয়া দিল। দুই কড়ির এক কড়ি দিয়া দেড় আঙুলে তেরো নদী পার হইয়া— কোথায় সাত চোর, তাদের খোঁজে চলিতে লাগিল!

সারাদিন খুঁজিয়া পাইল না—অনেক দূরে এক উইয়ের টিপির কাছে গিয়া সন্ধ্যা। সারাটি দিন খায় নাই, আজো বাবাকে পায় নাই; গা অলস, মন অবশ, উইয়ের টিপির তলে কুড়ুল শিয়রে দিয়া দেড় আঙুলে শুইতে শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রে, সাত চোর তো নয়—সাড়ে সাত চোর সেইখান দিয়া চুরি করিতে যায়। অন্ধকারে কিছু দেখে না, সাড়ে সাত চোরের আধখানা চোর ছোট-চোরের পা দেড় আঙুলের ঘাড়ে পড়িল;

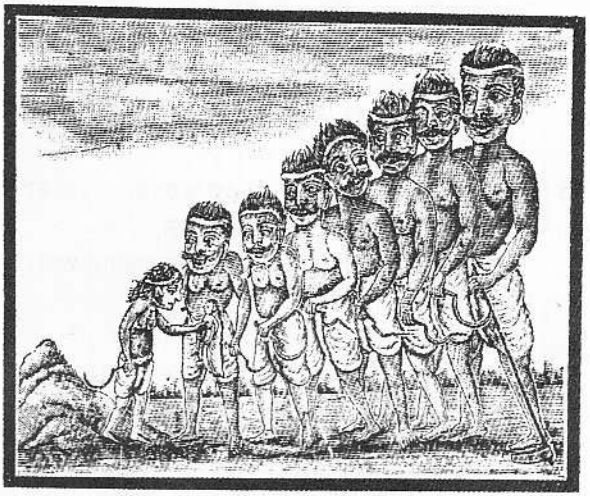

সাড়ে সাত চোর

ধড়মড় উঠিয়া দেড় আঙুলে চোরের পায়ে কুড়ুলের এক কোপ।—'কে রে ব্যাটা নিমকানা, চলেন তিনি পথ দেখেন না।'

ছোট চোর হাঁউ হাঁউ করিয়া চেঁচাইয়া তিন লাফে সরিয়া গেল; সকল চোর অবাক—জন নাই, প্রাণী নাই, মাটির নিচে কথা— 'দোহাই বাবা দৈত্য দনা; ঘাট হয়েছে, আর হবে না।'

শুনিয়া দেড় আঙুলে বড় খুশি হইল, বলিল, 'যাক ভাই, যাক ভাই—তা ভাই, তোরা কে রে?'

সাড়ে সাত চোর বলে—

'আমরা সাড়ে সাত চোর—
মাটি ফুঁড়ে কথা কও,
তুমি তো ভাই কম নও,
তুমি ভাই কে?'

'আমি ভাই মানুষ,—এই যে আমি, এই যে! তোমরা ভাই, কোথা যাচ্ছ ভাই?'

উকিঝুঁকি, হাতাড়ি-পিতাড়ি—শেষে ছোট্ট চোর দেখে —ও বাব্বা, এক একটুখানি দেড় আঙুলে, তার আবার কুড়ুল হাতে! হাত তুলিয়া চোখের কাছে নিয়া দেখে—ওঁম্মা!—

তিনি আবার টিকি ফরফর তিন ভঙ্গি রাগে গর গর—
টিকির আগে ভোমরা, ইনি আবার কোন্ দেশী চেঙরা?

হো হো! হি হি! হু হু! হে হে! হা হা! হৈ হৈ! হৌ হৌ! হঃ হঃ! সাড়ে সাত চোরে যে হাসি! গলিয়া ঢলিয়া গড়াগড়ি!!

শেষে কোনোমতে তো হাসি থামুক; চোরেরা বলিল, 'চল্ রে চল্ আড়াইয়ের বাড়িতে যাই।'

দেড় আঙুলে জিজ্ঞাসা করিল, 'আড়াইয়ে কে ভাই?'

'তুই হলি দেড়কো, তুই জানিস নে? ওপারে আড়াইয়ে এক কামার আছে, সাড়ে সাতটা সিঁদকাঠি দিবে, ব্যাটা রোজ ফাঁকি দেয়, আজ সেই বুড়োকে দেখাব।'

দেড় আঙুলে দেখিল— ওরে ! তার সঙ্গে আমার মিতালি, তারি ঘরে সিঁদ দেবে? বলিল,

'ও ভাই! সে বাড়ি যাস নি,
সে বাড়িতে আছে শাঁকচুন্নি;
ঘাড়টি ভেঙে রক্ত খাবে,
সাড়ে সাত গুষ্টি এক্কেবারে যাবে।

—তা তো নয়, রাজকন্যা বিয়ে করিস তো, রাজার বাড়ি চল্!'

চোরেরা— 'হি হি হি! হে হে হে ! হৈ হৈ হৈ! সে তো ভালোই, সে তো ভালোই!' তা রাজার জামাই হবে, তারা কি যে-সে! গোঁফে তা, গায়ে মোড়ান চোড়ান, বলিল—'তা

যেখানে যেতে উথাল-পাতাল তেরো নদীর জল।'

দেড় আঙুলে বলিল, 'কেন, এই যে ওপার যাচ্ছিলি?'

'যাচ্ছিলুম, তো যাচ্ছিলুম, করতে যেতুম চুরি—
রাজার জামাই হব, তাও দিয়ে আপন কড়ি?

দেড় আঙুলে বলিল, 'আচ্ছা, একটা কড়ি আছে, নিয়ে চল্।'

কড়ি নিয়া ভারি খুশি সাড়ে সাত চোর নদীর পাড় গিয়া ডাকিল্—

'হেই হেই পাটনি! রাত জাগা খাটুনি—
করবি পার পাবি কড়ি তাতে কেন গড়িমড়ি?
পাটনি না পাটুড়ি বজ্জর বাঁধের আঁটুনি।
কানা কড়ির আশটা কানা কড়ির বাসটা
রাজবাড়ির মাছটা বিড়ালে খায়,
হেদে হেদে পাটনি, ঝটপট করে নে ভাঙা নায়!'

কড়ি নিয়া, পাটনি ভাঙা নায়ে করিয়া পার করিয়া দিল। নামিবার সময় চোরেরা আবার কড়িটি চুরি করিয়া নিল।

দেড় আঙুলে বলিল, 'না ভাই, কড়ি ফিরিয়ে দিয়ে এস।'

'হু। দিব না তো কী, সাত হাঁড়ি ঘি।' চোরেরা মুখটা নাড়া দিয়া উঠিল।

দেড় আঙুলে আর কিছুই বলিল না।

যাইতে যাইতে রাজার বাড়ি। দেড় আঙুলে গিয়া রাজার দুয়ারে ঘা দিল—

'রাজামশাই, রাজামশাই, খাট পালঙ্ক ছাড়,
পার হয়ে না দেয় পারের কড়ি, কেমনে ঘুম পাড়?'

চোরেরা থরথর কাঁপে। রাজা বলিলেন, 'কে? পারের কড়ি না দেয় তারে শূলে চড়িয়ে দে।' সাড়ে সাত চোর শূলে গেল।

'শূলে গেল কি সাত চোরেরা? হায়! হায়! হায়!'

রাজা কাঁদেন, রানি কাঁদেন, কানা কন্যা কাঁদেন, দেড় আঙুলে বলিল, 'চোর তো আমি এনে দিয়েইছিলাম; তা রাজকন্যার বর হবে, না, আপন দোষে শূলে গেল, তার আমি জানি কী? রাজামশাই,কাঠুরে দাও!'

'কী রে! বারে বারে ভ্যান ভ্যান, বারে বারে ঘ্যান ঘ্যান!
দে তো নিয়ে খুদেটাকে চোরেদের সঙ্গে!'

ফুট!—দেড় আঙুলেকে কেউ খুঁজিয়াই পাইল না।

চোরের রাজ্যে, চোরের রাজা, সাড়ে সাত চোরের শূলের কথা শুনিল। নায়ে নায়ে ভরা দিয়া যত রাজ্যের চোর আসিয়া রাজার রাজপুরিময় চুরি আরম্ভ করিল। সিপাই-শান্ত্রী ধোঁকা, রাজা হলেন বোকা! নিতে নিতে—

চাটি নিল, বাটি নিল, সব নিল চোরে,
মাটি পেতে পান্তা খান, রাজা মনে মনে পুড়ে।

তখন—'চোরের বাদী সেই খুদে, তারে এখন এনে দে!'

কোথায় বা খুদে, কোথা খুঁজিয়া পায়? দেড় আঙুলে ঘাসবন থেকে হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল :

রাজামশাই, রাজামশাই

এত এত সিপাই চোরের কাছে টিপাই;
আমার কাছে ঘুরসুড়নি এমন সিপাই জন্মেও নি।

তা যদি বল তো সব চোর তাড়িয়ে দি!'

'আচ্ছা, কী চাও?'

'রাজকন্যা চাই।'

'ইশ কথা দেখ!—আর কী?'

'পুরির রাজা হুলোবেড়ালটি।'

'আর কী?'

'পোশাক আশাক, হীরের পাগড়ি।'

রাজা সব দিলেন, কেবল বলিলেন, 'চোর যদি ছাড়ে পুরি, তবে কন্যা দিতে পারি। কানা কন্যা গেলেই কী, থাকলেই কী।'

তখন কেশ-বেশ পোশাক করিয়া, হুলোবেড়াল ঘোড়া, সাতনলা হাতে, টিকির নিশান মাথে, টিকিতে খোলস বেঁধে, দেড় আঙুলে চোরের রাজ্যে গিয়া হানা দিল।

কোথা দিয়া কোথা দিয়া যায়, বিড়ালে হাঁড়ি খায়—যত চোরনী পেরেশান! খোনা, খুন্তি, পোলো, থোলো, রায়বাঁশ, গলফাঁস সকল নিয়া রাজ্যের যত চোর অলিতে গলিতে খাড়া হইল। খানা খুঞ্জি ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

দেড় আঙুলে বলিল, 'আচ্ছা রও!

সাতনলা, সাতনলা করছ এখন কী?
চুপটি করে আছ কেন লাউয়ের খোলসটি?'

সাতনলা বলিল, 'কী?'

খোলস বলিল, 'কী?'

নল চিরিয়া হাজার চুল, খোলস ফেটে ভীমরুল! চেরা চেরা নল সুঁচ হেন ছোটে, ভীমরুলের হুল পুটপুট ফোটে।

'আঁই মাঁই কাঁই; বাবা রে ! মা রে ! তালুই রে ! শ্বশুর রে !'—চোরের রাজ্যে হুড়াহুড়ি গড়াগড়ি, লুটোপুটি ছুটোছুটি ! তিন রাত্তিরে ঘরদোর ফেলে যত চোর-চোরনী দেশ ছেড়ে পালিয়ে পুলিয়ে দূর ! চোরের রাজা 'চ্যাং পিছলে'; চ্যাং পিছলেকে বাঁধিয়া নিয়া দেড় আঙুলে টিকি ফরর ফরর জুতা ফটর ফটর পাগড়ি ফুলাইয়া নল ঘুরাইয়া রাজার কাছে গেল—

রাজামশাই, রাজামশাই, রাজকন্যা আর
কাঠুরে দাও।'

তখন রাজা বলেন—"তাই তো ! তাই তো !—

বীরের চূড়া পিপ্পল কুমার, এস রে বাপ, এস,
তোমার তরে রাজ্য ধন, সিংহাসনে বস।
কন্যা আছে চোখ-বিঁধুলী, দিলাম তোমায় দান—
কাঠুরেরে আন্ দিয়ে পুষ্পরথ খান।'
পুষ্পরথে চড়িয়া কাঠুরিয়া আসিল।

তখন কুনোরানির থুতু দিয়া দেড় আঙুলে পিপ্পল কুমার রাজকন্যার চোখ ফুটাইল—ব্যাঙ এল, কুনোরানি এল; দেড় আঙুলে গিয়া কামার-মিতাকে আনিল; ধুমধাম, বিয়ে সিয়ের রাজ-রাজ্য তোলপাড় !

লাফে লাফে ব্যাঙ নাচে,
দাড়ি নাড়িয়া কামার হাসে।

মায়ের দুঃখ গেল, বাপকে সোনার কুড়ুল গড়ে দিল; তখন রাজা শ্বশুর, রানি শাশুড়ি, জামাই বেয়াইকে রাজ্য দিয়া, তপস্যায় গেলেন—দেড় আঙুলে পিপ্পল কুমার এক বেলা রাজ্য করে, এক বেলা বাপের সাথে কাঠ কাটে —

খুঁট—খুট-খুট !!

হুলোবেড়াল ঘোড়া

সোনা ঘুমাল

খোকন সোনা চাঁদের কোণা—
খোকার মাসি এল দেশে,
আকাশের চাঁদ পাতালের চাঁদ
ধরে এনেছে.....ছে— !
জোছনা জোছনা ফটিক ফুটেছে !
দেখি চাঁদ দেখি চাঁদ
কোন্ দেশের ফল ?
দুই পাড়েতে ফেটে পড়ে
রূপ ঝল মল।
দুই পাড়ে রে রূপের সাগর,
গোলায় আছে ধান—
মায়ের কোলে শোন্ রে জাদু
ঘুমপাড়ানি গান।
শুনে শুনে খোকন-মণির
দু-পু-র রাত—
কেঁদে যে চাঁদ ফিরে গেল,
কেউ দিল না ডাক।
কেউ দিল না ডাক রে—খোকন ঘুমিয়ে পড়েছে,
খেয়ে খোকন আম-সন্দেশ ধুলায় লুটেছে !
ধুলার বড় ভাগ্যি, খোকন গায়ে মেখেছে !
খোকার মা লো খোকার মা !
তোর সোনা ঘুমাল—
আঁচল পেতে তুলে নে যা—
পাড়া জুড়াল।
ও—মা লো মা !
এমনি দস্যি ছেলে—তার ঘুম আসে না !!

সমাপ্ত

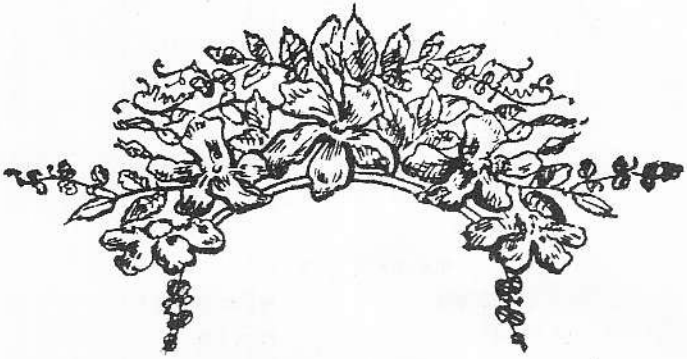

ফুরাল

আমার কথাটি ফুরাল
নটে গাছটি মুড়াল।
"কেন রে নটে মুড়ালি?"
"গরুতে কেন খায়?"
"কেনরে গরু খাস?"
"রাখাল কেন চরায় না?"
"কেন রে রাখাল চরাস না?"
"বৌ কেন ভাত দেয় না?"
"কেন লো বৌ ভাত দিস না?"
"কলা গাছ কেন
পাত ফেলে না?"
"কেন রে কলা গাছ
পাত ফেলিস না?"
"জল কেন হয় না?"
"কেন রে জল হস্ না?"
"ব্যাঙ কেন ডাকে না?"
"কেন রে ব্যাঙ ডাকিস না?"
"সাপে কেন খায়?"
"কেন রে সাপ খাস?"
"খাবারধন খাব নি? গুড়গুড়ুতে যাব নি?"

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
আলোকিত মানুষ চাই
অন্তর্ভুক্তি নং
798537

www.alorpathsala.org

আলোর পাঠশালা

School of Enlightenment

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841801612511